"বসুমতী"র ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক
লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার

ইষ্টার্ণ—ল—হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

ছয় আনা

প্রথম সংস্করণ
মহালয়া, আশ্বিন
সন ১৩৪৪ সাল

Printed & Published by G. B. Dey
at the Oriental Printing Works,
18, Brindabun Bysack Street, Cal.

এই বইখানি প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য,—আশাকরি, বিষয় সূচী থেকেই জানা যাবে। শিশু মহলে "**শিশু-সারথি**"র সমাদর হ'লে সকল শ্রম সার্থক মনে করব।

আর একটি কথা—সোদরপ্রতিম শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভড় এই পুস্তকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, ভাব, ভাষা ও নানা বিষয়ে সাহায্য করায় তাঁকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি। তার সম্পাদনা ও সহায়তা না পেলে পুস্তকখানি শীঘ্র প্রকাশিত হবার পক্ষে দুর্ঘট হত। ইতি—১৮ই আশ্বিন, মহালয়া, ১৩৪৪ সাল।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

গ্রন্থকার প্রণীত

নীতিগল্পগুচ্ছ

ছেলেমেয়েদের আদরের বই। পারস্য কবি সেখ সাদির
"গুলুস্তাঁর" কয়েকটি নীতিমূলক গল্পের সাজি।
রংবেরঙের ছবিতে ভরা। সর্ব্বজন প্রশংসিত।
চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ছয় আনা।

গল্পবীথি

কয়েকটি সরস গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুমনের কল্পনাকে অব্যাহত
রাখা হয়েছে। ২য় সংস্করণ, দাম ছয় আনা।

জাতকের গল্পমঞ্জুষা

গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মকথার কয়েকটি ভাল ভাল নীতিমূলক
গল্পের চয়নিকা। দাম ছয় আনা।

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস * * * কলিকাতা

উপহার

অনুক্রম

রবার্ট ব্রুস ও মাকড়সা

— "ভাল মন্দ"

—বাবা, আপনি পড়ার সময় পড়া ও খেলার সময় খেলতে বলেন, দাদা কিন্তু খেলতে দেখলেই বকেন, কেন বাবা ?

—কেন জান ? তোমার দাদা জানে লেখা-পড়া করা ভাল, আর খেলা-ধূলা করা মন্দ, তাই খেলতে দেখলেই বকে।

—সত্যই যদি লেখা-পড়া করা ভাল, আর খেলা-ধূলা করা মন্দ হয়, তাতে দাদা যে আমায় খেলতে দেখলে বকেন, তা' ত ভালই করেন, বাবা।

—আদবেই ভাল করে না। তবে শোন বলি। যেদিন তুমি দাদার ভয়ে দিন রাত পড়ে মাথার বেদনায় চেঁচাতে থাক, সে দিনের কথা কি ভুলে গেছ ?

—তা ভুলিনি বাবা, ওটা কি বেশি পড়ার জন্যেই হয় ?

—তাই ত হয়। তোমার শক্তির চাইতে বেশি ভারি জিনিস যদি খুব জোর ক'রে তোল, তা' হলে গায়ে বেদনা হয় না কি ?

—তা খুব বেদনা হয় বাবা।

—কাজেই এটুকু বুঝা গেল,—অধিক পরিশ্রমে শরীর যেমন নিস্তেজ ও বেদনাযুক্ত হয়, সেইরূপ অধিক পড়া-শুনা বা অধিক চালনায় মস্তিষ্ক নিস্তেজ ও বেদনাভরা হ'য়ে থাকে। তাই বেশি পড়াও ভাল নয়, আর বেশি খেলাও ভাল নয়। চাই নিয়মিত পড়া ও নিয়মিত খেলা, তাইতে শরীর ও মস্তিষ্ক দুইই ভাল থাকে। এ সব তোমার দাদা জানবে কেমন ক'রে।

—কেন বাবা দাদা জানবেন না ?

—তোমার দাদা এখনও ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কতটুকু। যখন বড় হবে তখন আমার কথার অর্থ বুঝতে পারবে।

—কি বুঝবে বাবা ?

—বুঝবে, শরীর ও মন ব'লে দুটি জিনিস আছে। যে হাত, পা, চোখ, কান অর্থাৎ যাদের নিয়ে তুমি চলা-ফেরা করছ, এটাকে শরীর বলে জানবে। আর মন কা'কে বলে জান ? শরীর চোখে দেখা যায়, মন চোখে দেখা যায় না, তবে কাজ-কর্ম পড়া-শুনা করতে তাকে বুঝা যায়।

—কেমন ক'রে বাবা ?

—তার আগে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এক এক দিন তুমি খুব তাড়াতাড়ি পড়া তৈরি ক'রে ফেল, আর এক এক দিন দেরী হয়, কেন বল দেখি ?

—ঠিক বাবা। যে দিন পড়াটা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করব ব'লে মন দি, সে দিন তাড়াতাড়ি মুখস্থ হ'য়ে যায়। আর যদি পড়ায় মন না দিয়ে খেলা করতে করতে, অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে মুখস্থ করি, তাহ'লে অনেকক্ষণ ধ'রে পড়লেও মুখস্থ হয় না।

—তুমি ঠিক বলেছ। মন দিয়ে পড়লেই পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়। এই মন এমন একটা শক্তি, যা'র বলে লেখা-পড়া, খেলা-ধূলা, এমন কি যে কোন কাজ তুমি কর বা ভাব সবই মনের দ্বারা হয়। আর এই মন কোথা থেকে আসে জান,—মাথা থেকে।

—তবে দাদা যেটা বলে বা করে, সেটা আমার মাথাতেই আসে না, এটা কেন হয় বাবা ?

—এটা কি জান ? মনের উপর বুদ্ধি ব'লে আর একটি শক্তি আছে। এই শক্তি মনকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

—সে কি রকম বাবা ?

—ধর তুমি পড়ার সময় খেলা করছ। তোমার দাদা তাই দেখে রেগে তোমায় দুই চড় বসিয়ে দিলে। তুমি দাদার উপর রাগ ক'রে চুপ ক'রে বসে ভাবতে লাগলে। এই যে ভাবনা কোথা থেকে এল বল দেখি ?

দাদা কেন খেলতে দেখলেই বকেন···

—মাথায় যে মন আছে, সেই মন থেকেই ভাবনা এল। তবে আপনি যে বললেন, বুদ্ধি মনকে চালায়, সে কি বাবা ?
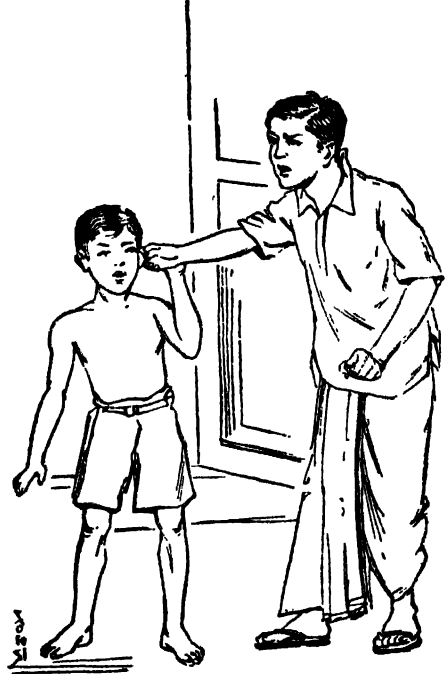
—সেটা কি তা মন দিয়ে শুন। দাদার কাছে মার খেয়ে তুমি রাগ ক'রে বসে রইলে, কেমন ?

—হাঁ বাবা।

—তারপর বসে বসে ভাবতে লাগলে, দাদা যে তোমায় মেরেছেন সেটা দাদা ভাল করেছেন না মন্দ করেছেন। মনে কর, প্রথমে রাগটা যখন খুব চড়ে উঠেছিল, তখন দাদার প্রহারটা খুব মন্দ ব'লে মনে হ'য়েছিল, তার পরেই ক্রমে ক্রমে যতই রাগ কমে আসতে লাগল, ততই তোমার মনে হ'তে লাগল, দাদা ত আমায় মিছিমিছি মারেননি, পড়ার সময় পড়া না করায় অন্যায় করেছি বলেই মেরেছেন, দাদা ঠিকই করেছেন। এই মনে হতেই দাদার উপর তোমার রাগ পড়ে গেল,—দাদা যে ভালর জন্যই তোমায় মেরেছেন, তা বুঝতে পেরে, দাদার উপর রাগের বদলে ভক্তি, ভালবাসা এসে পড়ল। এই যে ভাল-মন্দ বিচার মনের ভেতর এসে দাদার উপর তোমার রাগ দূর ক'রে দিল, ঐটিকেই বুদ্ধি বলে জানবে। আর যে বালক মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে-চিন্তে কাজ করে, তাকেই বুদ্ধিমান্ বলে এবং সকলে তাকে ভালবাসে।

—বাবা, আমি যদি মন দিয়ে লেখা-পড়া শিখি, পড়ার সময় পড়া, ও খেলার সময় খেলি, তা'হলে দাদা আমায় ভালবাসবেন ত, আর বকবেন না ত ?

—যে বালক বুদ্ধিমানের মত লেখা-পড়ায় মন দেয়, তাকে কেউ ভাল না বেসে কি থাকতে পারে ?

—আচ্ছা বাবা, এক একদিন খেলার সময় যখন খেলি, তখন দিদি আমায় শুধু শুধু বকে কেন ?

—শুধু শুধু বকে না। তবে বকে কেন জান, আমি সব শুনেছি।

—কি শুনেছেন বাবা, কি দোষ করেছি আমি?

—তোমার বুদ্ধির দোষে তুমি বকুনি খাও।

—আমি কি বুদ্ধির দোষ করি বাবা?

—তোমার দোষ এই যে, তুমি খেলার সময়ে এত মেতে যাও যে, অনেক সময় খেতেও ভুলে যাও।
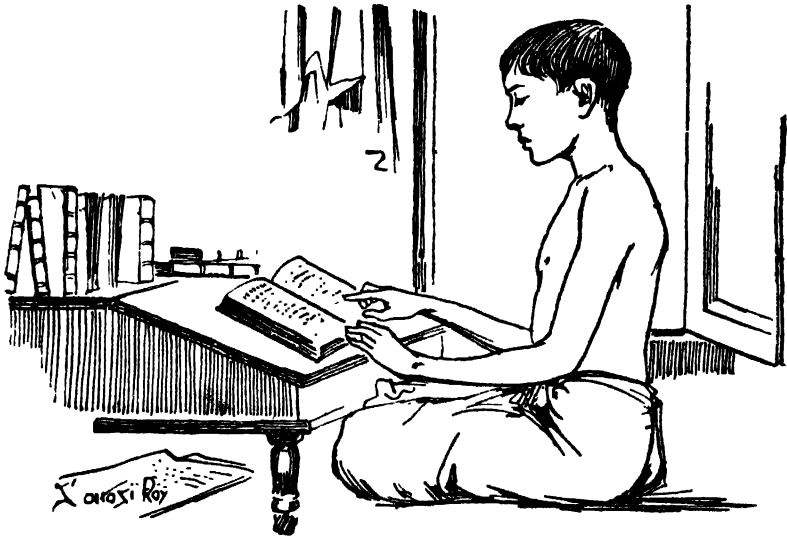
মন দিয়ে পড়লেই পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়…

—আমি খাই না খাই তাতে দিদির কি এসে যায়, আমি ত দিদিকে খেতে বারণ করি নি।

—ঐটি ত তোমার বুদ্ধির দোষ। ঠিক সময়ে পড়া, ঠিক সময়ে খেলা যেমন দরকার, ঐ সঙ্গে ঠিক সময়ে খাওয়াও তেমনি দরকার।

—কেন বাবা? লেখা-পড়া, খেলা-ধুলোর সঙ্গে খাওয়াটা আসছে কেন?

—আসছে কেন জান? তা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে।

—কি বাবা?

—তুমি রেল ইঞ্জিন বা রেল গাড়ি দেখেছ?

—হ্যাঁ দেখেছি।
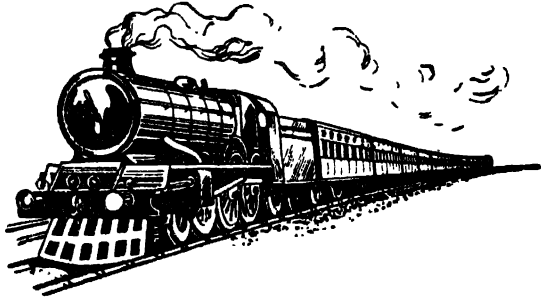
—ঐ রেলগাড়ি কিসের জোরে ছোটে তা জান?

—না।

—রেল ইঞ্জিনে যে বয়লার আছে, তাতে জল ও কয়লার আগুন থাকে, ঐ আগুনের তাপে বয়লারের জল গরম হ'য়ে ফুটে ওঠে। তাইতে ধোঁয়ার মত সাদা বাষ্প হয়, ঐ বাষ্পের জোরে ইঞ্জিন গাড়ির চাকা ঘুরতে থাকে, তখন রেলগাড়িও শব্দ করতে করতে ছুটতে থাকে।

—রেল ইঞ্জিনের সঙ্গে আমাদের শরীরের কি যোগ আছে বাবা?

—সম্বন্ধ এই, কয়লা ও জল যোগান না দিলে যেমন রেল ইঞ্জিন

চলা বন্ধ হ'য়ে যায়, সেই রকম তুমি যদি নিয়মমত খাবার ও জল না খাও, তা'হলে তুমিও রেল ইঞ্জিনের মত অকেজো হ'য়ে পড়বে। কেননা, আমাদের শক্তির মূল খাদ্য ও পানীয়। সেজন্য যদি ঠিক সময়ে তুমি আহার না কর, তা'হলে তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে, হয় ত, খুব শক্ত অসুখেও ভুগবে। আবার যেমন রেল ইঞ্জিনের কল-কব্জা পরিষ্কার না করলে ইঞ্জিন খারাপ হ'য়ে যায়, তেমনি খেলা-ধূলা, চলা-ফেরা না করলে শরীর খারাপ হয়। তাই লেখা-পড়াও যেমন দরকার আর শরীর রক্ষাও তেমনি দরকার। মোট কথা এটা যেন স্মরণ থাকে যে, সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, বুদ্ধি ও জ্ঞান মানুষের উন্নতির সোপান।

কাজ ও কৌশল

—তুমি সাঁতার কাটতে কাটতে বিশ হাত জলে গেলে, আমি কিন্তু দু হাতও যেতে পারলাম না।

—শিখলে তুমিও পারবে।

—সাঁতার আবার শিখতে হয় না কি? হাত পা ছুঁড়লেই ত সাঁতার কাটা হয়।

—তা কি হয়। হাত পা ছোঁড়বার কৌশল আছে। যা তা ক'রে ছুঁড়লেই হয় না। এই ত আমরা দুজনে জলে স্নান করতে নেমেছি, আমি সাঁতার জানি তুমি জান না, সাঁতার কাট দেখি?

—কি ক'রে কাটব, জানিনে যে।

—এই যে বললে, হাত পা ছোঁড়াই সাঁতার।

—বললাম বটে, কিন্তু আমার এখন ভয় করছে যদি ডুবে যাই।

—আমার ত কিছুই ভয় করে না।

—কেন করে না বল ত?

—কি জান, যার কৌশল জানা আছে বা যে শেখে, তার কাজ করতে সাহস হয়। শুধু সাঁতারে কেন, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য সকল বিদ্যাতেই কৌশল শিখতে হয়।

—তাই না কি?

—তা নয় ত কি? লেখা-পড়া বিদ্যা শেখবার যেমন কৌশল আছে, সাঁতারই বল, আর শিল্প ব্যবসায়, বাণিজ্য যে বিদ্যাই বল, সবেরই শেখবার কৌশল আছে।

—লেখা-পড়া শেখবার আবার কৌশল কি? পড়লেই হল। এযে তুমি আমায় নূতন কথা শেখাচ্ছ।

—নূতন কথা নয়, একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

—সে কেমন ধারা।

—তবে বলি শুন। মনে কর দুটি ছেলে একই পড়া পড়ে। প্রথম ছেলেটি স্কুলের পড়াটি একবার পড়েই বই মুড়ে রাখে, আর দ্বিতীয়টি একবার পড়া শেষ ক'রে পুনরায় যদি অভ্যাস করে, তা হ'লে কার পড়া ভাল হবে? শুধু তাই নয়, বার বার

সাঁতার শিখতে হয়। হাত পা ছুঁড়লেই হয় না···

অভ্যাস দ্বারা নূতন পড়া নিজে নিজে বুঝবার একটা ক্ষমতা বা কৌশল জন্মায়।

—বাঃ! ঠিক কথাই ত। তবে তুমি কি প্রত্যহ অভ্যাস ক'রে সাঁতার শিখেছ?

কুমোর আজ যে কৌশলে হাঁড়ি গড়ছে···

—নিশ্চয়ই। কোন কাজে কৌশল শিখতে গেলে অভ্যাস ও মনোযোগ এ দুটি খুব দরকার। ঐ দেখ কুমোর কেমন হাঁড়ি তৈরি করছে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি লোকের সঙ্গে গল্প করছে। দেখলে মনে হয়, কত সহজ। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। আমরা যদি ঐ ভাবে করতে যাই, মোটে হাঁড়ি

গড়তে পারব না। কুমোর আজ যে কৌশলে হাঁড়ি গড়ছে, সে-কৌশল কত মনোযোগ ও অভ্যাসের দ্বারা জন্মেছে।

—আচ্ছা বেশ, সেই মান্ধাতা আমল থেকে যে ভাবে হাঁড়ি গড়ার নিয়ম আছে, ঠিক সেই ভাবেই কেন ও গড়ছে। কোন নূতনভাবে গড়ে না কেন?

কর্মবীর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়···

—বেশ কথা জিজ্ঞেস করেছ। একটা কিছু নূতন ক'রে গড়তে হ'লে সূক্ষ্ম বুদ্ধি, কৌশল ও সেই সঙ্গে ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তবে নূতন জিনিস জন্মাতে পারে, নচেৎ পারে না। আমাদের দেশে শিল্প কার্য যারা করে, তারা মূর্খ অর্থাৎ লেখা-পড়া বা জ্ঞানের কোন চর্চা করে না। সুতরাং নূতন কিছু আবিষ্কার করবার শক্তিও তাদের হয় না। ইউরোপ বা আমেরিকায় আমরা দেখি, শিল্পের নানা বিভাগে বড় বড় মাথাওয়ালা বৈজ্ঞানিকেরা হাতে কলমে কাজ ক'রে যন্ত্রপাতির কত উন্নতি করেছেন, কিন্তু আমাদের দেশে যে দু চারটি ছেলে লেখা-পড়া শিখেছেন, তাঁরা শিল্প কাজ করাকে একেবারে হেয় মনে করেন, সেজন্য আমাদের দেশের কুটির শিল্পের যন্ত্রপাতি, এ যুগের মত উন্নত ধরণের না হওয়ায় ধ্বংসের পথে যেতে বসেছে। তাই এই যন্ত্রযুগে

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশ অনেক পিছনে পড়ে আছে। এর আর একটি কারণ কি জান? সচরাচর সকলের মধ্যে এই একটা ভুল ধারণা আছে যে, শিল্প প্রভৃতি কাজে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের কিছুই আবশ্যক করে না, এ সব মূর্খদের জন্য। কিন্তু আসলে তা নয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, গবেষণা যাহা কিছু সবই শিল্পে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে যতটা প্রযোজ্য হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি ছাড়াও আর একটি জিনিস দরকার, সেটি কর্মশক্তি। যে জাতির যত কর্মশক্তি, সে জাতি তত উন্নত। এ কর্মশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করায়। আমাদের দেশের কর্মবীর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁর আত্ম-জীবনীর একস্থানে এই কথাই বলেছেন—"যদি কোন লোক ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে, তা'হলে সে দশগুণ কাজ করতে পারে।"

—বাবা, ঐ যে বাবুটি বইয়ের দোকানে বসে আছেন, উনি খুব বিদ্বান্, না বাবা ?

—ও যে বিদ্বান্ তা' কি ক'রে জানলে ?

—জানলাম এই জন্যে যে, ঐ বাবুটির কাছে কোন পুস্তক চাইবামাত্র তখনি অতগুলি বইয়ের আলমারির ভেতর থেকে বার করে দেন।

—দেখলে মনে হয় বটে, কিন্তু তা' নয়।

—কেন নয় বাবা ? ইনি হাজার হাজার বইয়ের খবর রাখেন, এ কি কম বিদ্যের কথা ?

—তুমি ছেলেমানুষ ব'লে অতটা বুঝতে পারছ না।

—কেন আপনাকে ত বলতে শুনেছি,—যাঁরা বই নিয়ে সর্বদা নাড়া-চাড়া করেন, তাঁরাই বিদ্বান্, পণ্ডিত।

—আমার কথাটা ঠিক মনে ক'রে রেখেছ জেনে বড় আহ্লাদ হ'ল, কিন্তু কথাটার মানে ঠিক ধরতে পারনি।

—তা' হ'লে কি মানে হবে ?

—বই নাড়া-চাড়া মানে এই নয় যে, বইগুলিকে এক আলমারি থেকে অন্য আলমারিতে রাখা, যেমন এই বইয়ের দোকানের বাবুটি ক'রে থাকেন।

যেমন বইয়ের দোকানের বাবুটি ক'রে থাকেন……

—বই নাড়া-চাড়া মানে আমি ত তাই বুঝি বাবা, তবে এর আবার অন্য মানে কি ?

—তোমায় যে ক'খানা বই কিনে দিয়েছি, কেন কিনে দিয়েছি জান ?

—জানি। আমায় পড়া শেখাবার জন্যে।

—ভাল, তবেই বুঝে নাও, শুধু নাড়া-চাড়া করবার জন্যে তোমায় বই কিনে দিইনি, পড়বার জন্যেই কিনে দেওয়া হয়েছে, এই না ?

—তা' ত হ'ল। তবে নাড়া-চাড়া মানে বই পড়া কোত্থেকে এল।

—এল কেন জান, তুমি যেমন তোমার স্কুলের সঙ্গী ছেড়ে থাকতে পার না, তেমনি যাঁরা বিদ্বান্, পণ্ডিত তাঁদের সঙ্গী পুস্তক। কারণ তাঁরা

পুস্তক আলোচনা ভিন্ন একদণ্ডও স্থির থাকতে পারেন না। জ্ঞান লাভের জন্য নানা গ্রন্থ আলোচনা করাকেই আমরা চলিত কথায় বই নাড়া-চাড়া বলে থাকি।

—তা' ত বুঝলাম বাবা। তবে বইয়ের দোকানের বাবুটি জ্ঞান উপার্জনের জন্য যে পুস্তক নাড়া-চাড়া করেন না, এ কথার অর্থ কি?

—অর্থ এই, দোকানের বাবুটি ব্যবসায়ের খাতিরে কোথায় কোন্ বই আছে সেইটুকু বলতে পারেন, কিন্তু বইয়ের মধ্যে কি শেখবার জিনিস আছে তা' বলতে পারবেন না। আসল কথা জ্ঞান উপার্জন করার নামই বই নাড়া-চাড়া করা।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

—পড়া ছাড়া কি জ্ঞান জন্মায় না।

—জন্মায় বই কি। পড়ায় জ্ঞান খুব পাকা হয়, আর শুনলে পড়ার মতন তেমন পাকা হয় না।

—ভাল বুঝতে পারলাম না বাবা।

—ধর, তুমি তোমার পুস্তকের একটা গল্প, তার বানান, কথার মানে, অর্থ, ভাবার্থ, করে পড়লে। প'ড়ে সেই গল্পটা একজনকে বললে। এখন কথা হচ্ছে, যাকে তুমি গল্প বললে, সে গল্প ছাড়া আর কিছু জানলে না, কিন্তু তুমি তার চেয়ে বানান-টানান কত কি শিখলে, ঠিক কি না?

—তা' ঠিক। পড়লে শুনার চেয়ে জ্ঞান খুব বেশি হয়।

—তবে এর মধ্যে একটু কথা আছে।

—কি কথা বাবা?

—শুধু পড়লেই হয় না, পড়া অনেক রকম আছে।

—পড়ার আবার রকমারি কি বাবা?

—বল দেখি, তোমার ক্লাসের সকল ছেলেই কি সমান পড়া বলতে পারে?

—তা' পারে না।

—কেন পারে না?

—ভাল ক'রে পড়ে না।

—বেশ কথা। তা'হলে বুঝতে হবে পড়া ভাল-মন্দ আছে।

—তা' আছে বৈ কি। যে মন দিয়ে পড়ে, সে ক্লাসে ভাল পড়া বলতে পারে, আর যে মন দিয়ে না পড়ে, সে ভাল পড়া বলতে পারে না, মাস্টার মশায়ের কাছে বকুনি খায়।

—আবার এর মধ্যেও কথা আছে। দেহের মধ্যে মন যেমন একটা জিনিস, সেই রকম মেধা ব'লে আর একটা জিনিস আছে। যে ছেলের মেধা বেশি, সে অল্পেই বুঝে নেয়, পড়া-শুনা প্রভৃতি সকল কাজে তাকে বেশি খাটতে হয় না।

—হ্যাঁ বাবা, তা' ঠিক বলেছেন। আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে আছে, সে পড়া-শুনা খুব কম করে, কিন্তু রোজ ক্লাসে ফার্স্ট বসে, আর ফি বছর একজামিনে ফার্স্ট হয়।

—এই মেধা কমে ও বাড়ে।

—সে কি বাবা? মেধার আবার গাছের মতন কম-বাড় আছে না কি?

—আছে বৈ কি। গাছকে যত্ন করলে, সে গাছ যেমন শীগ্‌গির বেড়ে ওঠে, তেমনি যে লেখা-পড়ায় বা কাজে বেশি মন দেয়, তারও মেধা শীগ্‌গির বেড়ে ওঠে।

—আর এও দেখেছি বাবা, যে ভাল ছেলের কথা বলছিলাম, তার মেধা এত বেশি যে, এক ঘণ্টা ধ'রে মুখস্থ করেও যা মনে থাকে না, সে একবার পড়েই হু হু ক'রে মুখস্থ ব'লে যেতে পারে।

—তার শরীরও খুব ভাল ব'লে মনে হয়।

—নিশ্চয়। তার শরীর যেমন ভাল, মনও তেমনি ভাল, মেধাও খুব বেশি।

—তা' ত হবেই। আর অন্য এক সময়ে বলেছি, শরীর, মন, বুদ্ধি, এ সবই একসূত্রে গাঁথা। একটার জোর কমে গেলে অন্যগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হ'তে থাকে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—তা' ঠিক বাবা। যে দিন অসুখ বোধ হয়, সে দিন পড়া-শুনা এমন কি খেলা-ধূলা কিছুই ভাল লাগে না। রাত দিন শুতে ইচ্ছে করে; মনটাও সেই সঙ্গে এত খারাপ হ'য়ে থাকে যে, তা বলবার নয়।

—ঠিক কথা। এইখানেই বুঝে নিতে হবে যে, যার শরীর গতিক

ভাল নয়, যে চিররুগ্ন, সে মেধাবী হ'লেও, তার পড়া-শুনায় মন থাকলেও, সে কিন্তু উন্নতি করতে পারে না। কেননা সে নিজের শরীর নিয়েই ব্যস্ত। তবে এটাও মনে রাখ, সে-ই উন্নতি করতে পারবে, যে সুস্থ, মনোযোগী, মেধাবী, চরিত্রবান্, পরিশ্রমী ও দীর্ঘায়ু।

—বাবা, আপনি অন্য গুণের সঙ্গে দীর্ঘায়ু এ কথা বলবার মানে কি ?

—এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই, সকল গুণে গুণী যে ব্যক্তি, তিনি যদি দীর্ঘকাল বেঁচে না থাকেন, বা অল্প বয়সেই মারা যান, তা'হলে দেশ তাঁর কাছে বেশি কিছু উপকার পাবে না।

—বেশ, তারপর বাবা।

—এই যে, আমাদের দেশে যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা যদি স্বল্পায়ু হন, তা'হলে দেশে কি আর সুদিন দেখা দেবে ? কেননা যে কোন একটা পাঠ সমাপ্ত করতেই ২০।২৫ বৎসর কেটে যায়। ঐ সকল মেধাবী ছেলেরা পড়া শেষ ক'রে, কোন কাজে প্রবেশ ক'রে, উন্নতির মুখেই যদি তাদের আয়ু শেষ হয়, তবে দেশের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি কি ক'রে হবে, তুমিই বল ? তার সাক্ষী দেখ না কেন, সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, সার্ পি, সি, রায়, সার্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষিগণ, দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন ব'লেই আজ জগতে কতদিক থেকে কত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। তাঁরা যদি বহুদিন পূর্বে মানবলীলা সাঙ্গ করতেন, তা'হলে কি আমাদের দেশে উন্নতি দেখা দিত ? তাই বলি, স্ব-ধর্মে মতি ও স্বাস্থ্য ঠিক রেখে মান অপমান ভুলে গিয়ে, স্বদেশের ও স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহা নিশ্চয় ক'রে বলা যেতে পারে।

——০✱০——

—হাঁরে কেষ্ট, গোপাল আর পড়তে আসে না কেন, তার কি হ'য়েছে ?

—কি জানি মাস্টার মশাই, আগে বেশ পড়া করত, এই মাস খানেক কি যে তার হ'য়েছে কিছুই বুঝতে পারিনি।

—কি হ'য়েছে কিছু খোঁজ খবর রেখেছ।

—আমি একা কেন মাস্টার মশাই, মা-বাবা আর সবাই জিজ্ঞাসা ক'রে হার মেনে গেছেন।

—গোপাল কি বলে ?

—কোন কথাই বলে না, বেশি পীড়াপীড়ি করলে বলে, কিছু হয়নি।

—ডাক্তার দেখালে ত হয়।

—ডাক্তার দেখান হ'য়েছে।

—ডাক্তার কি বলেন ?

—ডাক্তারেও কিছু ঠিক করতে পারছেন না।

—ভাল ডাক্তার দেখান হ'য়েছে ত ?

—খুব ভাল ডাক্তার দেখান হ'য়েছে মাস্টার মশাই

—তাঁরা কিছু ঠিক করতে পারছেন না কেন, এর কারণ কিছু বলতে পার ?

—ডাক্তাররা বলেন, রোগী যদি রোগ চেপে রাখে, ডাক্তারের সাধ্য নাই যে রোগ সারায়।
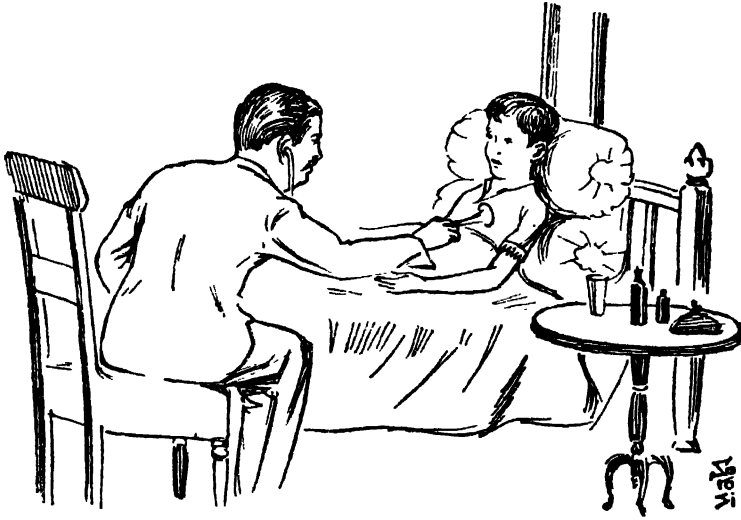
খুব ভাল ডাক্তার দেখান হয়েছে···

—তাই ত, গোপাল রোগ এমন ক'রে লুকুচ্চে কেন ?

—ওষুধ খাবার ভয়ে, মাস্টার মশাই।

—রোগে কষ্ট পাচ্ছে সেও ভাল, তবু ওষুধ খাবে না, আচ্ছা ছেলে ত

—এখন রোগ কম আছে তাই সে বুঝতে পাচ্ছে না, যখন বেড়ে উঠবে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করবে, তখন ওষুধ খায় কি না দেখা যাবে।

—কেষ্ট তুমি ঠিকই বলেছ। রোগটা তেমন জোর হয়নি ব'লে এখনও চুপ ক'রে আছে, যখন বেড়ে উঠবে, যন্ত্রণা হবে, তখন কষ্টে সব কথা বলে ফেলবে, তখন শিশি শিশি ওষুধ খাবে, সব ভিরকুটি বেরিয়ে যাবে।

—ঠিক বলেছেন মাস্টার মশাই। আমিও অনেক সময় গোপালের মতন রোগ চেপে রাখি, কষ্ট হ'লেও কাকেও বলিনা। তারপর রোগ যখন বেড়ে ওঠে আর চুপ ক'রে থাকতে পারিনি, তখন ব'লে ফেলি, সব ভিরকুটি বেরিয়ে যায়, তখন ডাক্তারের শিশি শিশি ওষুধ চোখ কান বুজে খেতে হয়।

—তোমরা দু ভাই দেখ্‌ছি রোগকে গ্রাহ্য কর না, যখন রোগ বেড়ে ওঠে, যন্ত্রণা হ'তে থাকে, চেপে রাখতে পার না, তখন বল।

—ওই ত আমাদের অভ্যাস।

—এ অভ্যাসটা ভাল নয়।

—কেন নয় মাস্টার মশাই ?

—এমন অনেক রোগ আছে, তা'তে যন্ত্রণা হয় না ব'লে চিকিৎসা হয় না ; তাই রোগ ক্রমে ক্রমে বাড়তেই থাকে।

—এমন কি রোগ মাস্টার মশাই ?

—যেমন ছুলি একটা রোগ।

—ঠিক বলেছেন মাস্টার মশাই। আমাদের ক্লাসের এক ছেলের মুখময়, গাময় ছুলি। প্রথমে একটু আধটু দেখা দিয়েছিল, এখন সেই ছুলি বেড়ে গিয়ে মুখময় গাময় হয়েছে।

—এই দেখ, যন্ত্রণা নাই ব'লে চিকিৎসাও হয়নি তাই বেড়ে গেছে। যন্ত্রণা থাকলে চিকিৎসা হ'ত, ছুলিও আরাম হ'য়ে যেত।

—তাই ত দেখছি মাস্টার মশাই, রোগের যন্ত্রণা হ'লেই চিকিৎসা হয়, নচেৎ হয় না।

—আর এইটুকু জেনে রাখ, রোগের যন্ত্রণা আছে বলেই মানুষ বেঁচে আছে, তা না থাকলে মানুষ বাঁচত না।

—কেন মাস্টার মশাই এর মানে কি?

—এর মানে কি জান? ধর, একজনের চোখের অসুখ হ'ল, অথচ ছুলির মত কিছুই যন্ত্রণা অনুভব করেলে না, চিকিৎসাও কিছু হ'ল না। তা'তে এই হ'ল ভেতরে ভেতরে রোগটা বেড়ে গিয়ে চোখটা নষ্ট হ'য়ে গেল। যন্ত্রণা হ'লে ওটি হ'ত কি? চিকিৎসা বা রোগের প্রতিকার হ'ত, আরামও হ'য়ে যেত।

মন আনন্দ পায় কাজে···

—ঠিক বলেছেন মাস্টার মশাই। আজ থেকে আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, রোগ কখনও চেপে রাখব না।
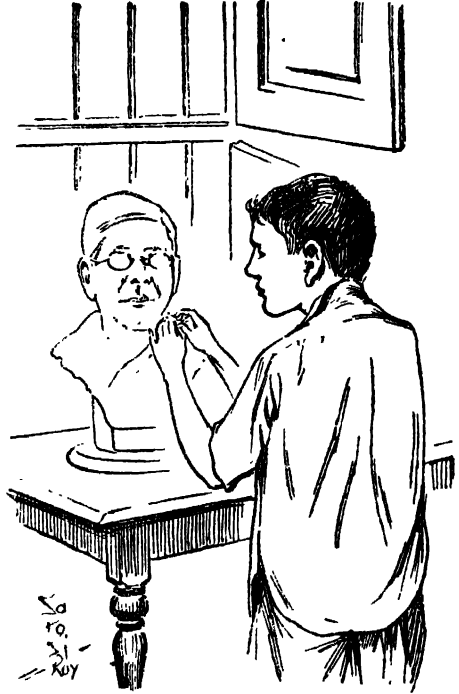
—এই রকম দেহের যেমন রোগ আছে, মনেরও তেমনি রোগ আছে।

—মনের আবার রোগ কি ?

—শরীর খারাপ হ'লেই মনও খারাপ হয়, এ কথা তুমিও জান। তা ছাড়া মন খারাপ হ'লে শরীরও খারাপ হয়। যেমন, তুমি যদি কোন কারণে মনে খুব দুঃখ পাও, তা হ'লে মনমরা হ'য়ে থাক, এই মনমরা অবস্থাতে শরীরও খারাপ হয়। সুতরাং মনকে আমাদের আনন্দে রাখতে হবে। মন আনন্দ পায় কাজে, তাই নিষ্কর্মা হ'য়ে বসে থাকলে মন খারাপ হ'য়ে যায়। তোমরা সর্বদাই একটা-না-একটা ভাল কাজ খুঁজে নেবে, তা' সফল করতে প্রাণপণ করবে। আর কাজ সফল হ'লে মনে যে আনন্দ হয়, সে আনন্দের তুলনা নাই। এই আনন্দই আমাদের শরীরের পুষ্টি ও আয়ু বৃদ্ধি করে।

—ঐ সঙ্গে এও বুঝে রাখ, রোগের যন্ত্রণা আছে বলেই, রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা হয়, আর রোগের চিকিৎসা হয় ব'লেই মানুষ বেঁচে আছে।
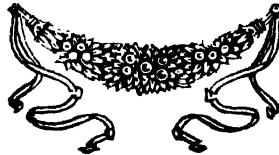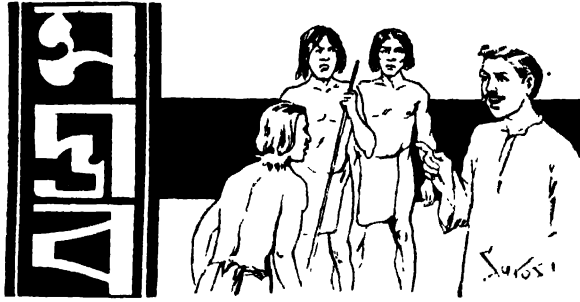
—যেখানে পাঁচজনে একত্রিত হয়, সেখানে লোকনিন্দা ও পরচর্চা ক'রে অনেককে আনন্দ পেতে দেখা যায়। এই রকমে আনন্দ উপভোগ করবার কারণ আর কিছু নয়, লোককে দেখায় যে, তারা খুব ভাল লোক, এবং ও সব দোষ তাদের মধ্যে নাই।

—মনে কর এক জন গণ্য-মান্য লোক যদি দৈবাৎ দোষ ক'রে ফেলেন, এবং সকলের কাছে দোষ স্বীকার ক'রে অনুতপ্ত হন, তা'হলে সেই দোষের কথা তুলে তাঁকে অপদস্থ করা উচিত নয়। কিন্তু যারা পরনিন্দা বা পরচর্চা ক'রে সুখ পায়, তারা সেই সামান্য ত্রুটীকে পর্বত প্রমাণ ক'রে বাড়িয়ে তাঁকে মনুষ্য নামের অযোগ্য ক'রে তুলতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। এইভাবে যারা পরনিন্দা বা পরচর্চা করে, জানবে তাদের কুস্বভাব এমন মজ্জাগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, তা' ছাড়াবার নয়। এরূপ লোকের সঙ্গ থেকে দূরে থাকবে।

—যেখানে রাজা মহারাজ প্রভৃতি মানী লোকের আদেশ অমান্য হয়, সেখানে

তাঁদের অশস্ত্র বধ করা হ'ল ব'লে জানবে; এজন্য তাঁদের আদেশ কদাচ অমান্য করবে না। কথা বলবার সময় বেশ ভেবে-চিন্তে কথা বলবে। সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অর্থাৎ মিষ্ট সম্ভাষণ করবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কখন বলবে না।

লোকনিন্দা ও পরচর্চা ক'রে অনেকে আনন্দ পায়···

—এমন অনেক লোক আছে, যারা, যার-তার নিন্দা ক'রে বেড়ায় কিন্তু তাদের যে কত দোষ তা' তারা দেখে না।

—উপকারীর প্রত্যুপকার করা মানুষ মাত্রেরই উচিত; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, উপকার পেয়েও প্রত্যুপকার করা দূরে থাকুক বরং তার বিপরীতই ক'রে বসে।

—একবার প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পরিচিত ভদ্রলোক বলেছিলেন,—বিদ্যাসাগর মশাই, অমুক লোক আপনার বড় নিন্দা ও কুৎসা ক'রে বেড়ান।

—বিদ্যাসাগর উত্তরে বলেছিলেন,—কৈ, ও লোকের কখন উপকার করেছি ব'লে ত মনে হয় না, তবে কেন তিনি আমার নিন্দা বা কুৎসা করবেন।

—বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে উপকার পেয়েছেন, এমন কোন লোক যদি কখন তাঁর নিন্দা করতেন, তাতে তিনি আশ্চর্য হ'তেন না। কারণ তাঁর জীবনের লক্ষ্যই ছিল পরের উপকার করা। তাঁর মতে যার উপকার করব, তার কাছ থেকে ফিরে উপকার পাব, এ আশা না রাখাই ভাল। কারণ কার্য-গতিকে যদি অসময়ে কোন উপকার না পাই, তাতে আমার মনের শান্তি নষ্ট হবে না; অর্থাৎ মনের শান্তি যাতে বজায় থাকে এই চেষ্টা করাই আমাদের উচিত।

—গরিব ও বড়মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই। যে কাজ একজন গরিব-গৃহস্থ করলে, কতদিকে কত নিন্দা ওঠে, সেই কাজ বা তার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট কাজ ক'রে বড়মানুষ কতই না সুখ্যাতি পান। তাই মনে হয়, আচার-ব্যবহার, বিধি-ব্যবস্থা এমন কি আইন-কানুন পর্যন্ত যেন বড়মানুষের পক্ষে টেনে করা, অর্থাৎ শত দোষেও তাঁরা নিষ্কলঙ্ক। গরিব যেন তাঁদের হাতের পুতুল। বড়মানুষ তাদের মারুক, ধরুক, কাটুক, গরিবের তাঁদের বিপক্ষে যেন কোন কথা বলবার অধিকার নাই। কিন্তু পাড়ার মধ্যে এর ব্যতিক্রম কতক দেখা যায়। তাই একটা চলিত কথায় আছে—"পাড়া পড়শি জব্দ হয় চখে আঙুল দিলে।" অর্থাৎ পাড়ার মধ্যে কেহ যদি অন্যায় কাজ ক'রে বসেন এবং সেই অন্যায়

আচরণের জন্য যদি পাড়ার মধ্যে নিন্দা ওঠে, তার ফলে সেই অন্যায়কারী ধনী-মানী যিনিই হউন না, তিনি পর্যন্ত জব্দ হ'য়ে যান, অর্থাৎ লোক-লজ্জায় তাঁর মাথা এমন নত হ'য়ে পড়ে যে, পুনরায় কোন অন্যায় কাজে সহজে প্রবৃত্ত হন না।
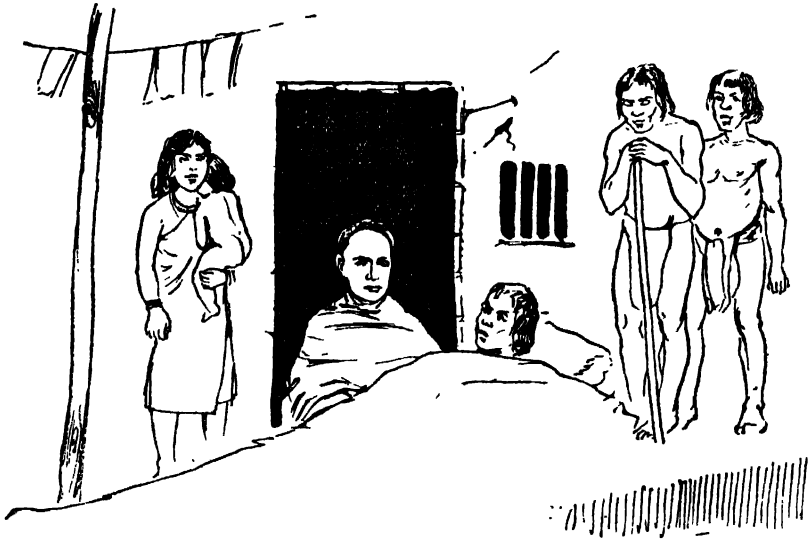
বিদ্যাসাগর সাঁওতাল কুটীরে রোগীর সেবায় রত···

—প্রকৃত দোষের জন্য নিন্দায় যদি লোকের কুস্বভাব ভাল হয়ে যায়, সে নিন্দায় দোষ দেওয়া যায় না। এরূপ নিন্দায় সমাজ, জাতি বা সমগ্র দেশের মঙ্গলই হ'য়ে থাকে, একে একরকম ভৎ'সনা বলা চলে। ফল কথায় ভাবী মঙ্গলের জন্য বা লোকের চরিত্র শোধনের জন্য যে নিন্দা ওঠে সে নিন্দায় জাতি

সমাজ ও দেশের কল্যাণই হয়ে থাকে, সে নিন্দা কোন কারণেই দুষণীয় নহে।

—বালকগণ, তোমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি বা আকর্ষণ থাকা দরকার। প্রত্যেকেরই চেষ্টা থাকবে, অর্থ, শরীর ও বাক্যের দ্বারা পরস্পরকে সহায়তা করা। যখনই কেহ কোন দুঃখ বা ব্যথার কথা জানাবে, তখনই তোমাদের উচিত প্রাণে প্রাণে তার ব্যথা অনুভব করা, এবং মিষ্ট কথায় হউক, কাজ ক'রেই হউক বা অর্থ দিয়েই হউক, সেই ব্যথা দূর করবার চেষ্টা করা। কেহ যদি কাহারও বিপক্ষে কোন কথা বলে, তখনই তার প্রতিবাদ করবে এবং তার গুণ কীর্তন ক'রে বক্তার মনে তার প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করবে। প্রত্যেকেরই উচিত নিজের হাতের কাজ দ্রুত ও সুন্দর ভাবে করতে, এবং নিজের যতক্ষণ ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ অন্যের সাহায্য না লওয়া।

—তোমাদের প্রতি যদি কেহ অসৎ ব্যবহার করে, তা'হলে তোমাদের প্রথম কর্তব্য, সেই অসৎ ব্যবহারের মূল অন্বেষণ করা। হয়ত দেখবে সেই অসৎ ব্যবহারের মূলে এমন বেদনা ও দুঃখ জড়িত আছে যে, তাতে তোমাদের হৃদয়ও তার প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠেছে, আর এই সহানুভূতিই তাকে তোমার আপন জন ক'রে গড়ে তুলছে।
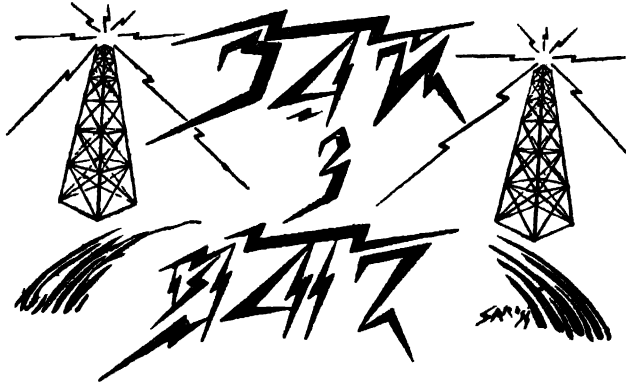
—দেখ দাদা দেখ, পুকুরের যেখানে ঢিলটা ছুড়লাম, তার চারদিকে কেমন চাকার মত বড় দাগ হ'ল, তারপর একটার পর একটা গোল দাগ হ'য়ে জলেতে মিলিয়ে গেল।

—তাই ত রে! দেখতে ভারি মজা ত! ছোট ঢিল ফেললে ছোট চাকা হ'য়ে পুকুরের মাঝেই মিলিয়ে যাচ্ছে, আর বড় ঢিল ফেললে চাকাটা বড় হ'তে হ'তে ডাঙায় এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

—দু-ভাই তখন ছোট-বড় ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে পুকুরে ছুড়তে লাগল। একজন বৃদ্ধ লোক সেই পুকুরের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলে দুটিকে অনবরত পুকুরে ঢিল ছুড়ে আমোদ করতে দেখে, কাছে এসে হেসে বললেন—তোমরা পুকুরে ঢিল ছুড়ছ কেন?

—আমাদের খুশি।

—তা বুঝেছি। যাঁর পুকুর তিনি বুঝি এখানে নাই ?

—এ ত আমাদের পুকুর।

—তবে, আমিও একটা ঢিল ছুড়ি, কেমন ?

—দু-ভাই তখন খিল খিল ক'রে হেসে বললে,—এই ইটখানা জোরে পুকুরের মাঝখানে ছুড়ে দিন না, বেশ মজা হবে।

—কি মজা হবে ?

—পুকুরের জল তোলপাড় হয়ে যাবে—আর জলটা চাকার মত হ'য়ে ঢেউ খেলতে খেলতে ডাঙায় এসে মিলিয়ে যাবে। ব'লে দু-ভাই আনন্দে লাফাতে লাগল।

—আচ্ছা বেশ, জিজ্ঞাসা করি, ঢেউটা ডাঙা পর্যন্ত এসে কেবল মিলিয়ে যায়, আর কিছু হ'তে দেখনি ?

—কই না।

—খুব যদি বড় ঢেউ হয়, তা'হলে ডাঙায় ধাক্কা পেয়ে আবার পুকুরের মাঝে ফিরে যায়, দেখেছ কি ?

—বাঃ! সে কি কখনও হয় ?

—কেন হবে না। একবার পরীক্ষা করেই দেখ না।

—এই ত এতবার ঢিল ছুড়লাম, ঢেউটা ডাঙায় ধাক্কা পেয়ে আবার পুকুরের মাঝে ফিরে গেছে, এমন ত একবারও মনে হ'ল না।

—এত বড় পুকুরে তা তুমি ঠিক ধরতে পারছ না। আচ্ছা এক কাজ কর, ঐ ডাবাটা জলে ভর্তি কর।

—জল ভর্তি ক'রেছি, তারপর কি করতে হ'বে ?

—আর কিছু করতে হবে না। এখন দেখ জলটা কেমন স্থির, কোন
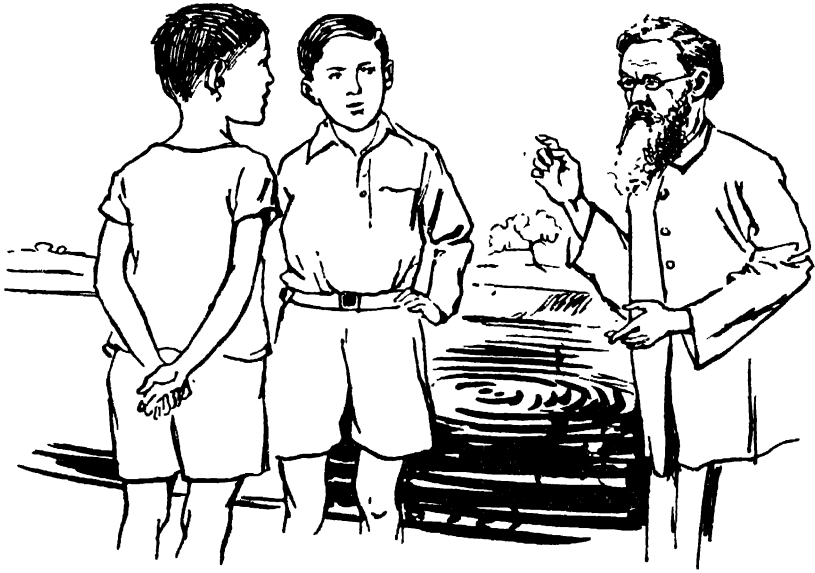
সেই কম্পন বা ঢেউ চাকার মত বড় হ'তে হ'তে······

ঢেউ নাই, এই দেখ ডাবার মধ্যে ঢিল ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ছোট্ট গোলাকার ঢেউ উঠছে, ঐ দেখ ঢেউটা ডাবার ধারে এসে ধাক্কা পেয়ে আবার ফিরে মাঝখানে যাচ্ছে, আবার মাঝখান থেকে ধারে আসছে। কেমন দেখতে পাচ্ছ ত ?

—কি আশ্চর্য ! পুকুরেও কি এমনি হয় ?

—নিশ্চয়ই । এখন বল দেখি আমরা কি শিখলাম ?

—আমরা শিখলাম, ঢিল ছুড়লে ঢেউ চাকার মত বড় হ'তে হ'তে ডাঙায় এসে লাগবে এবং ধাক্কা পেয়ে আবার পুকুরের মাঝে ফিরে যাবে ।

—আচ্ছা বলুন ত কতবার ঢেউ এমনি যাওয়া আসা করবে ?

—ঢেউএর জোর যত বেশি হবে, তত বেশিবার ঢেউটা এমনি যাওয়া আসা করবে ।
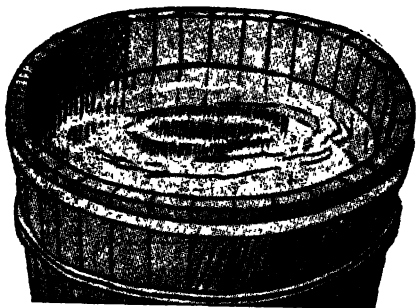
—তারপর কি হবে ?

—তারপর ঢেউএর শক্তি ফুরিয়ে গেলে জলে মিলিয়ে যাবে ।

—ঢেউ শক্তি পায় কোথা থেকে ?

—এ ক্ষেত্রে তোমারই কাছ থেকে ?

—সে কি কখন হয় ?

—নিশ্চয়ই ! যখনি তুমি ঢিল ছুড়লে, সেই ঢিল তোমার খানিকটা শক্তি বয়ে নিয়ে জলে আঘাত করল, তবে ত' জলে ঢেউ হ'ল । কাজেই তোমার যতটুকু শক্তি ঢিলটা বয়ে নিয়ে জলে ঘা দেবে, ঢেউয়ের শক্তিও সেই পরিমাণ হবে ।

—ঢিল না ছুড়লেও অনেক সময় দেখতে পাই, জলে কেমন ঢেউ হচ্ছে—এটা কেমন করে হয় ?

—সেটা অনেক কারণে হ'তে পারে, যেমন ধর বাতাসের জন্য । বাতাস জলে মৃদু আঘাত করে, তাই ঢেউ দেখা যায়, নদীর ছোট ঢেউ,

সমুদ্রের বিশাল ঢেউ, এই বাতাসের জন্যই হয়। তাই যখন ঝড় বয় তখন জলের ঢেউও বড় হয়।

—দেখুন দেখুন, পুকুরে কি একটা ভাসছিল, একটা মাছ সেটা গপ্ করে খেয়ে নিল, তারপরেই কেমন গোল ঢেউ হচ্ছে, আবার দেখুন ঐ খানটায় কাস্তের মত অর্ধেক গোল ঢেউ হচ্ছে। এক জায়গায় কেমন গোল ঢেউ, আর এক জায়গায় অর্ধেক গোল ঢেউ,—এমন কেন হয়?

—তার কারণ, কোন একটা শক্তি জলে যেখানে আঘাত করছে, কিংবা বাধা সৃষ্টি করছে, সেখানে গোলাকার ঢেউ হয়, আর যেখানে বাতাসে ঢেউ হয়, সেখানে জলে অর্ধেক গোল ঢেউ দেখা যায়। ঐ দেখ, জলে যেখানে বাঁশটা পোঁতা আছে, তার চারদিকে কেমন গোল ঢেউ, কেননা বাতাস ঐ বাঁশটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে—সেই কম্পনের ফলে জলও কাঁপছে, এবং জলের এই কম্পনের নামই ঢেউ। বুঝলে?

—হ্যাঁ।

—এবার তোমরা পুকুরের এইখানে থাক, আমি পুকুরের ঐ পাশে গিয়ে একটি ঢিল ফেলব, তোমরা ঘড়ি নিয়ে দেখ, এই ঢেউ তোমাদের কাছে কখন আসে? এই একটা বড় ইট ফেললাম, ঢেউ তোমাদের কাছে কতক্ষণে পৌঁছায়?

—এক সেকেণ্ড।

—আচ্ছা, এবার ছোট ঢিল ফেললাম, দেখ কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছাল?

—এবারেও এক সেকেণ্ড। অবাক্ কাণ্ড ত?

—হাঁ, অবাক্ হবার কথাই ত? কি শিখলে বল ত?

—বড় ঢিল ফেললে ঢেউ যে গতিতে যায়, ছোট ঢিল ফেললেও ঠিক সেই একই গতিতে যায়।

—ঠিক হয়েছে। এখন এ সম্বন্ধে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে ত বল ?

—আচ্ছা, বড় ঢিল ফেলায় আর ছোট ঢিল ফেলায় কোন তফাৎ কি নাই ?

—তফাৎ একটা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা' ঢেউএর গতি সম্বন্ধে নয়. সেটা হচ্ছে—ঢেউএর শক্তির পরিমাণ বিষয়ে। ঢেউএর শক্তি যত বেশি হবে, তত বেশি দূরে গিয়ে ঢেউটা মিলিয়ে যাবে। কেমন বুঝতে পারলে ?

—হ্যাঁ।

—পুকুরে এইখানে আমি একটা পাতা ফেলে দিলাম। এখন বল ত পাতাটা ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে কিনা ?

—না !

—কোথাও গাছের পাতা বা অন্য কিছু জলে ভেসে যেতে দেখেছ ?

—হাঁ দেখেছি, গঙ্গায় রোজ কত কি জিনিস ভেসে যায়। সময় সময় মাঝিরা দাঁড় টানে না, তবুও নৌকা কেমন ভেসে যায়।

—তা'হলে বলতে চাও, পাতাটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে ভাসতে ভাসতে যায়। কেমন ?

—হাঁ।

—কেন যায়, বলতে পার ?

—পারি। গঙ্গায় যে ঢেউ আছে, পুকুরে ত সে ঢেউ নাই।

—তার মানে, পুকুরে যদি ঢেউ থাকত তা'হলে পাতা ঢেউএর তালে তালে যেত, কেমন ? আচ্ছা বেশ, তোমার কথা সত্যি কিনা দেখা যাক। এই দেখ পাতার পিছনে একটা ঢিল ফেললাম, কেমন গোলাকার ঢেউ উঠল। ঐ দেখ, ঐ ঢেউ পাতার কাছে আসতে পাতাটা নড়ে উঠল, তারপরে ঢেউ চলে যেতে পাতা স্থির হ'ল,—এখন দেখ দেখি পাতাটা একটুও সরে গেছে কি ?

—না।

—তবে এইখানে বুঝে দেখ, ঢেউএর জন্য নৌকা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায় না। তবে কিসে এগিয়ে নিয়ে যায়, ভেবে বল দেখি ?

—ও বুঝেছি! বুঝেছি! জলের টানে নৌকা ভেসে যায়।

—ঠিক কথা, জলের টানকে শুদ্ধ কথায় প্রবাহ বা স্রোত বলা হয়। এখন একবার গঙ্গার ধারে যাই চল। তোমরা এই ঘাটে থাকবে, আমি ঐ ঘাটে গিয়ে এই গাছের ডালটা জলে ভাসিয়ে দেবো, তোমরা ঘড়ি দেখবে কতক্ষণে ডালটা তোমাদের কাছে আসে।

—বেশ, আমরা এই ঘাটে রইলাম।

—আমিও ডালটা নিয়ে চললাম, এই ছাড়লাম—কতক্ষণে পৌছাল বল দেখি ?

—এক মিনিটে।

—আচ্ছা, এবার আর একটা ডাল ফেললাম, তারপরে ডালের পিছনে একটি ঢিল ফেললাম, দেখত জলের ঢেউ আগে যায়, না ডালটা আগে যায় ?

—ঢেউটা গাছের ডালকে কাঁপিয়ে এগিয়ে গেল।

—তা'হলে কি বুঝলে ?

—বুঝলাম, প্রবাহের চেয়ে ঢেউএর গতি খুব বেশি।

—ঠিক, তোমরা এ সব বুঝতে পেরেছ দেখে আনন্দ হচ্ছে।

[২]

—জলের ঢেউ ও স্রোত সম্বন্ধে যে কথাগুলি বললাম, সে গুলো মনে রাখলে আরও অন্য অনেক বিষয় বুঝবার সুবিধে হবে।

—কি কি বিষয় ?

যেমন ধর, তুমি আমার কথা, আর আমি তোমার কথা বা যে কোন শব্দ কেমন ক'রে শুনি বলতে পার ?

—পারি। কান দিয়ে শুনি।

—ভাল। আমার কথা তোমার কানে, আর তোমার কথা আমার কানে কেমন ক'রে আসে ?

—কেমন ক'রে আবার, আপনিই আসবে।

—কথাগুলোর কি ডানা আছে যে, উড়তে উড়তে তোমার আমার কানে ফুরুৎ করে ঢুকবে ? তা নয়, বাতাস,—আমার কথা তোমার কানে, তোমার কথা আমার কানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

—কেমন করে বলুন না ?

—আমরা যে কথা কই, সেই কথায় চার পাশের বাতাস কেঁপে ওঠে, অর্থাৎ বাতাসে ঢেউ তোলে, ঠিক যেমন ঢিল ছুড়লে জলে ঢেউ হয়। বাতাসের এরকম ঢেউকে শব্দ-তরঙ্গ বলি। তারপর শব্দ-তরঙ্গ বাতাসের সাহায্যে আমাদের কানের পর্দা কাঁপায়, তাতে আমরা শুনতে পাই, এবার বল দেখি, কিসে শব্দ হয় ?

—ও ত বলা খুব সহজ। এই যেমন, বাঁশী বাজালে, কাঁসর, ঘণ্টা বাজালে, বাজনা বাজালে, গুলি ছুড়লে, হাতুড়ি দিয়ে দেওয়ালে ঠুকলে, গোলমাল করলে, আর কত রকমে শব্দ হয়।

—বেশ, তোমরা বললে, কাঁসর বাজালে শব্দ হয়, কেমন ? কিন্তু তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, যখনি তুমি কাঁসরে কাঠি দিয়ে ঘা দিবে, অমনি কাঁসরটি কাঁপতে থাকবে,—হয় ত এ কম্পন তুমি চোখে দেখতে পাবে না কিন্তু

কাঁসরে হাত দিলে বোধ হয় অনুভব করতে পারবে। কাঁসরের সেই কম্পন চারপাশের বাতাসে ঢেউ তোলে ব'লে আমরা কাঁসরের শব্দ শুনতে পাই।

—আপনি বললেন, কাঠি দিয়ে ঘা দিলে কাঁসরটি কাঁপতে থাকায় বাতাসে ঢেউ ওঠে, সেই ঢেউ কানে এলে আমরা শব্দ শুনতে পাই। আচ্ছা বলুন দেখি, সব জিনিসেই কি এমনি ক'রে ঘা মেরে শব্দ করি?

—সব জায়গায় আমরা যে ঘা মেরে শব্দ করি তা নয়। তবে মোটামুটি বলতে পারা যায়, যেখানে শব্দ, সেখানে একটা আঘাত বা ঠোকাঠুকি প্রায়ই থাকে; যেমন, হাতের উপর হাত-তালি দিলে শব্দ হয়, মেঝের উপর বই খানা ছুড়ে ফেললে, অর্থাৎ বই দিয়ে মাটিকে আঘাত করলে শব্দ হয় এমনি কত উদাহরণ দিতে পারা যায়।

—গাছের পাতার শির্ শির্ শব্দ, ধানক্ষেতের শন্ শন্ শব্দ, এও কি কোন আঘাতের ফল?

—যখন বাতাস পাতাগুলিকে কাঁপিয়ে দেয়, তখন পাতার সেই কাঁপুনির ফলে বাতাসেও ঢেউ ওঠে, তাই বাতাস বইলে গাছে গাছে, বনে জঙ্গলে, ধানক্ষেতে, শন্ শন্ শব্দ শুনতে পাই। আসল কথা, যে কোন শক্তির দ্বারা বাতাসে ঢেউ তুলতে হবে, তবেই শব্দ জন্মাতে পারে। আর বাতাস যদি না থাকে তা'হলে সাধারণত আমরা শব্দও শুনতে পাব না। এ কথা মনে থাকবে ত?

—হ্যাঁ।

—এখন জলের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জলে যেমন ঢেউ, বাতাসেও তেমনি ঢেউ হয়। জলের স্রোত আছে, বাতাসের স্রোত আছে কি না বলতে পার?

—নিশ্চয়ই আছে। আমরা দেখেছি যেদিন বাতাসের জোর নাই সেদিন

ঘুড়ি কিছুতেই ভাল ওড়ে না, লাট দিলে ভাল লাট খায় না। আর যে দিন বাতাসের জোর থাকে, সেদিন ঘুড়ি কেমন ভাল ওড়ে, আর লাট দিলে কেমন বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে ঘুরতে ঘুড়ি লাট খায়।

—হাঁ, বাতাসের জোরকেই বায়ু প্রবাহ বলে? বাতাসের প্রবাহ আছে, একথা তোমরা নিজেরাই বলতে পেরেছ দেখে ভারি খুশি হলাম। এখন বলতে পার বাতাসের তরঙ্গ এবং প্রবাহের গতি কি সমান?

—না, সমান নয়। তরঙ্গের গতি বেশি হবে।

—কিসে বুঝলে?

—ভাবলাম, জলে যেমন তরঙ্গের গতি স্রোতের গতির চেয়ে বেশি, তেমনি বাতাসের তরঙ্গের গতি, প্রবাহ-গতির চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি হবে। এই জন্য বলেছি।

—এমন ভাবে ভেবেছ দেখে আনন্দিত হলাম, কিন্তু ভাবলেই চলবে না, পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত, তোমার এই ধারণা ঠিক কি না? এস পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। এই দেখ, বেশ ফুর্ ফুর্ করে কেমন বাতাস বইছে, ঝরা পাতাগুলো কেমন ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছে। আমি এখান থেকে এই পেঁজা তুলোর এক টুকরা বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা ঐ খানে গিয়ে দাঁড়াও, দেখ কতক্ষণে পেঁজা তুলো তোমাদের কাছে উড়ে গিয়ে পৌঁছায়, আর তুলো ছেড়ে দেবার পরে আমি 'কু' শব্দ করব, দেখ, শব্দটা আগে শুনতে পাও, না তুলোটা আগে পৌঁছায়!

—শব্দটা তখনই শুনতে পেলাম, তার কত পরে তুলোটা এল।

—তবেই প্রমাণ হ'ল—বায়ু-তরঙ্গের গতি, বায়ু-প্রবাহের চেয়ে অনেক বেশি।

—এখন আস্তে বাতাস বইছে, কিন্তু যখন ঝড় বয়, তখনও কি প্রবাহের চেয়ে তরঙ্গের গতি বেশি হবে?

—নিশ্চয়ই। তোমরা দেখ না, ঝড় আসবার আগে ঝড়ের শব্দ শুনতে পাও। ঝড় হচ্ছে বায়ু-প্রবাহ, আর শব্দ হচ্ছে বায়ু-তরঙ্গ।

—জলের তরঙ্গ যেমন কোন ভাসমান জিনিসকে কেবল নাড়া দেয়, ঠেলে নিয়ে যায় না, বাতাসের তরঙ্গ কি তেমনি বাতাসে যা কিছু জিনিস ভাসে, তাকে কেবল নাড়া দেয়, ঠেলে নিয়ে যায় না?

—হাঁ, নাড়া দেয় কিন্তু ঠেলে নিয়ে যায় না। যেমন ধর, বাতাসের তরঙ্গ আমাদের কানের পর্দাকে নাড়া দেয়, তাই পর্দা কাঁপে, আর কাঁপলেই আমরা শুনতে পাই। এ ক্ষেত্রে আর একটা কথা মনে রেখ যে, শব্দ-তরঙ্গের গতি সব সময় এক, কিন্তু বায়ু-প্রবাহের গতি সব সময় সমান নয়।

[৩]

—এইবার আমি টেলিফোন ও রেডিও সম্বন্ধে কিছু বলব। তোমরা কেউ টেলিফোন দেখেছ?

—হ্যাঁ, আমাদের একটা টেলিফোন আছে। সে টেলিফোনে আমরা দুজনে মিলে কত কথাবার্তা কয়েছি।

—ওঃ! নিশ্চয় সেটা সুতোর টেলিফোন?

—হাঁ মশাই, আপনি কি ক'রে জানলেন?

—আগে আমরাও ছেলেবেলায় দুটো কাগজের চোঙা ক'রে, তাতে সুতোর সোজা টানা দিয়ে, দুই ভাই দুইদিক থেকে কত কথাবার্তা হাসিখুশি করেছি।

—আচ্ছা বলুন ত, সুতোর টেলিফোনে যতদূর থেকে কথাবার্তা বলি, ততদূর থেকে আমরা অমনি কথা বললে কেন শুনতে পাই না?

—তার কারণ, আমাদের মুখ থেকে যখনি কথা বেরোয়, তখনি

কথার শব্দ-তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শব্দ-তরঙ্গ যত দূরে যেতে থাকে, ততই তার শক্তি কমে যায়। সেইজন্য দূর থেকে কোন কথা যদি শুনতে পাই, সেটা খুব জোর হয় না। কিন্তু চোঙার ভেতর দিয়ে কথা কইলে আরও বেশি দূর পর্যন্ত শোনা যায়। তার কারণ চোঙার সাহায্যে কথা কইলে শব্দ-তরঙ্গ প্রথম
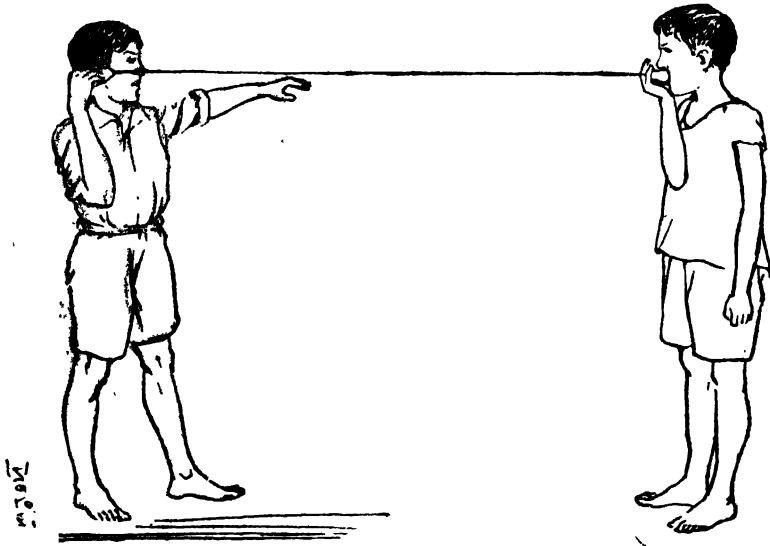
সুতোর টেলিফোনে কত কথা কয়েছি······

থেকেই চারদিকে না ছড়িয়ে একদিকেই যেতে থাকে, তাতে শব্দের জোর বেশি হয়, কাজেই অনেক দূর থেকে বেশ জোরে শোনা যায়। আবার দূরের শব্দ ভাল ক'রে শোনবার জন্য আমরা চোঙা ব্যবহার করি, কারণ এতে বাইরের শব্দ-তরঙ্গ ক্ষুদ্র পরিসর চোঙার মধ্যে প্রবেশ ক'রে শব্দটা খুব স্পষ্ট করে।

এইজন্য কানে যারা কম শোনে তারা চোঙা ব্যবহার করে। এ কেবল সুতোর টেলিফোনের চোঙা দুটোর কি প্রয়োজন তা বললাম। এখন সুতো কি কাজে আসে তা বলছি। তোমরা জেনে রাখ বাতাস ছাড়াও পৃথিবীর যে কোন পদার্থকে আশ্রয় ক'রে শব্দ-তরঙ্গ যাতায়াত করতে পারে। কাজেই সুতো ত একটি পদার্থ। এই হেতু সুতো বেয়ে শব্দ-তরঙ্গ যে যাতায়াত করে এতে ভুল নাই, সেইজন্য দূর হ'লেও শুনতে পাই। তবে মনে রেখ সুতো যত টান হবে আওয়াজটাও তত অধিক ভাল শোনা যাবে, যেমন সেতারের তার যত টান থাকে, আওয়াজটা ততই জোর হয়।

টেলিফোনের তার·

—আর বেশি দূর হ'লে সুতো ছিঁড়ে যায়, সেইজন্য বুঝি সুতোর বদলে তারের ভেতর দিয়ে কথাবার্তা যাওয়া আসা করে?

—না, তা নয়। টেলিফোনের তার বেয়ে কথাবার্তা মোটেই যাওয়া আসা করে না, সেই তার বেয়ে যাতায়াত করে বৈদ্যুতিক প্রবাহ।

—বাঃ। তা কি ক'রে হবে? যদি তার দিয়ে কথাই না গেল তবে কথাবার্তা কই কি ক'রে।

—সে কথা বোঝাতে হ'লে, টেলিফোন যন্ত্রটার কি কাজ, সেটা আগে জানা দরকার। টেলিফোনের যে অংশটা কানে লাগাই, তার নাম গ্রাহক, আর যেটা মুখের সামনে রেখে কথা কই, সেটার নাম প্রেরক। এই প্রেরক যন্ত্রের মধ্যে
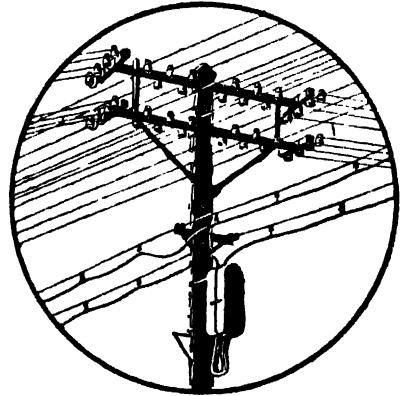
একটি লোহার পাত আছে, সেই পাতটি তোমার কথার শব্দ-তরঙ্গে কাঁপতে থাকে, এই কম্পন বৈদ্যুতিক প্রবাহে রূপান্তরিত হ'য়ে তার বেয়ে অপর প্রান্তের যন্ত্রে, (অর্থাৎ তুমি যাকে কথা বলছ, তার টেলিফোন যন্ত্রে,) পৌঁছে পূর্বের মত কম্পন সৃষ্টি করে। এই কম্পনে গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে কানের পর্দার মত যে পাতলা লোহার পাত আছে, তাহা কাঁপে। ইহাতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ আবার শব্দ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এই ভাবে টেলিফোন সাহায্যে আমাদের কথাবার্তা চলে। টেলিফোনে কথা কইলে মনে হয় না কি, যেন আমরা সামনা সামনি বসে কথা কইছি? অথচ কত মাইল দূর থেকে তুমি কথা বলছ। কেন এমন হয়? এর কারণ, এই বৈদ্যুতিক প্রবাহের শক্তি। শুনলে অবাক হতে হয় যে, বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে ১০০,০০০ মাইলের বেশি যেতে পারে।

টেলিফোন

—তা'হলে কলকাতায় রেডিও অফিসে যে গান বাজনা হয়, সেটাও কি তারের সাহায্যে আসে? রায় মশাইদের রেডিও আছে। তাঁদের ছাদে একটা তার টাঙানো আছে কিন্তু রেল গাড়ির রাস্তার পাশে টেলিগ্রাফ তারের মত খুব লম্বা তার, রায় মশাইদের বাড়ি পর্যন্ত আসে নি ত?

—রেডিওতে যে গান বাজনা, বক্তৃতাদি শুনি, সেটাও তরঙ্গের খেলা।

—রেডিও অফিসে মাইক্রোফোন নামে একটি যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রটির সামনে কথা বলা, গান গাওয়া, বা বাজনা বাজান হয়। মাইক্রোফোনের কাজ

হলো যে, এর সামনে যে শব্দ হবে, তাকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করা। বেতার প্রেরক যন্ত্র সেই বিদ্যুৎ-শক্তিকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিণত করে। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শূন্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই শূন্য বা আকাশ জিনিসটা কি? বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, জল, স্থল, বায়ুর মধ্যে এবং যেখানে জল, স্থল, বায়ু কিছুই নেই, সেই বিরাট শূন্যতার মধ্যেও এই বিশ্ব ব্যাপিয়া একটা কিছু আছে, যাহার নাম দেওয়া হ'ল ঈথর। এই ঈথর দেখা যায় না, স্পর্শ ক'রে অনুভব করা যায় না। এই ঈথর ঢেউ তুললে প্রচণ্ডবেগে সেই ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ শূন্যে ছেড়ে দিলেই সমস্ত জগৎ জুড়ে যে ঈথর-সমুদ্র রয়েছে তাতে তরঙ্গ ওঠে—ঠিক যেমন জলে ঢিল ছুড়লে ঢেউ ওঠে। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ কত বেগে যায় জান?—প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ মোটামুটি বলা যেতে পারে যে, প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবীকে সাড়ে সাত বার প্রদক্ষিণ করতে পারে।
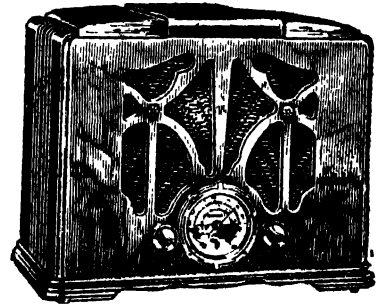
রেডিও শোনবার যন্ত্র…

—যাইহোক আমাদের ছাদে টাঙানো আকাশ তার সেই বৈদ্যুতিক বা রেডিও তরঙ্গ ধরে। আকাশ-তার বেয়ে সেই ঢেউ রেডিওসেটে আবার বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই বৈদ্যুতিক শক্তি লাউড-স্পিকার সাহায্যে শব্দে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই ভাবেই আমরা গান বাজনা শুনি।

চৈত্র মাস! বেলা দেড়টা। রোদ্দুরে কাঠ ফাটচে। এমন সময় একটা লোক মাঠ দিয়ে ছুটেছে। ছুটেছে ত ছুটেছে। ছুটতে ছুটতে গলদঘর্ম হ'য়ে গেছে। নিশ্বাস ঘন ঘন বইছে। আর ছুটতে পারছে না।

এমন সময় সেই মাঠে এক পথিকের সঙ্গে দেখা। পথিক লোকটির অবস্থা দেখে, তাকে অত্যন্ত হাঁপাতে দেখে, জিজ্ঞেস করলেন,—হাঁ গা, তুমি ছুটছ কেন? তোমার কি হয়েছে?

লোকটি হাঁফাতে হাঁফাতে বললে,—ব'লে লাভ কি? আপনাকে ব'লে কিছু হবে না।

—যদি কিছু করতে পারি তাই।

—বটে বটে ছুটছি, কেন জানেন, ঐ দেখুন মাটির উপর আমার সামনে ওই যে ছায়া ওর হাত এড়াতে পারছি না। এত চেষ্টা করছি, এত ছুটোছুটি করছি, তবু ছায়া সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছে।

এই ব'লে লোকটা কেঁদে ফেললে।

তার কান্নায় আগন্তুকের দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, পাগল মনে ক'রে হেসে বললেন,—এর জন্য দুঃখ কি ? ওটা ত' আপনার দেহের ছায়া। ছায়ার হাত ছাড়ান শক্ত ব'লে মনে হচ্ছে,—আসলে কিছুই শক্ত নয়।

—বেশ শক্ত—খুব শক্ত। মশাই, ওর জ্বালায় আমি পাগলপারা হয়েছি।

—বুঝেছি। মিথ্যে বস্তুকে সত্য ব'লে জেনে তোমার এই দুর্গতি হয়েছে,—তুমি বেখলে প্রাণটি হারাতে বসেছ।

—আপনি বলছেন ভাল। আসল কথা ছেড়ে দিয়ে বাজে কথা ক'য়ে বকছেন ভাল। যত দোষ আমারই দেখছেন।

—বাজে কথা নয়। আসল কথা কি জান সব ভুয়ো—ছায়াবাজি। সত্যের ছায়া মিথ্যা। সত্য বস্তু না থাকলে মিথ্যে থাকে না। এই যে তোমার দেহের ছায়া পড়েছে, এই ছায়া মিথ্যা। তোমার পিছনে সূর্য। দেহের উপর সূর্যের রশ্মি পড়ায় তোমার দেহের ছায়া তোমার সামনে মাটিতে পড়েছে। তুমি যদি মিথ্যে ছায়ার হাত থেকে বাঁচতে চাও, সূর্যের দিকে মুখ কর, তা'হলে ঐ ছায়া চলে যাবে তোমার পিছনে। তার মানে হচ্ছে, সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখে চললে, তোমার সামনের পথ সর্বদাই আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। যাহা কিছু মিথ্যা সে প'ড়ে থাকবে পিছনে। কিন্তু মিথ্যা তোমায় সহজে ছাড়বে না, সে ছায়ার মত তোমায় অনুসরণ করবে। তাই বলি, সত্য বস্তুর আশ্রয় নিতে হবে, তবেই আমরা পিছনের মিথ্যার মোহ কাটাতে পারব।

———:———

কোঁকোঁর কোঁ কোঁ! একটা কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর এ পাড় থেকে ও পাড়ে লাফালাফি করে। কখন ভাসে কখন ডোবে, আর আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে হেসে গড়াগাড়ি দিতে থাকে। সে জানে দুনিয়াতে যদি কেউ সুখী থাকে ত সেই।

একদিন হঠাৎ একটা সহুরে ব্যাঙ কুয়োয় প'ড়ে যায়। কুয়োর ব্যাঙটা তাকে দেখে প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনে এই ছিল, পৃথিবীতে যত ব্যাঙ আছে, সকলের চাইতে সে-ই বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে এমন কি আকারেও

বড়। একা কুয়োর মধ্যে রাজত্ব ক'রে ক'রে তার মন অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে, সে কি আর কাউকে গ্রাহ্য করে? বরং সে যে এত বড় একটা জলাশয়ের অধীশ্বর, এই বাহাদুরি জানাবার জন্যে সহুরে ব্যাঙকে দেখিয়ে দেখিয়ে কুয়োর পাড়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে টিট্‌কিরি দিয়ে বলতে লাগল,—কি মজা! কি মজা! এত মজা কখন ভোগ করেছ কি! করবে কোত্থেকে, এত জল পাবে কোথা? এক গণ্ডুষ জলে বাস ক'রে, পেঁকো মাটি খেয়ে, গতরখানা ফুলিয়েছ, আমার সুখ বুঝবে কি!

এই ব'লে কুয়োর ব্যাঙ এ পাড় থেকে ও পাড়ে লাফ মারতে সুরু করলে; আবার জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, ডুব সাঁতার, চিৎ সাঁতার, দাঁড়া সাঁতার কতই কাটতে লাগল।

সহুরে ব্যাঙ সবই দেখলে। মনে মনে বলতে লাগল,—এর চোখ না ফোটালে আর চলছে না। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন আমার কর্ত্তব্য ক'রে যাই। এই ভেবে সে বললে,—দেখ ভাই, যদি তুমি কিছু মনে না কর, তা'হলে একটা কথা বলি।

কুয়োর ব্যাঙ দম্ভ ক'রে মুখ বেঁকিয়ে বললে,—তুমি যা বলবে তা আমি আগেই বুঝে নিয়েছি। থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে।

সহুরে ব্যাঙ তার কথার রকম দেখে, না হেসে থাকতে পারলে না,— হিঃ হিঃ ক'রে হেসে ফেললে।

কুয়োর ব্যাঙ তার হাসি দেখে চটে লাল, এই মারে ত এই মারে। রেগে বললে,—দেখ, হেস না বলছি! তাচ্ছিল্য ক'র না বলছি! তোমার পক্ষে ভাল হবে না।

সহুরে ব্যাঙ তার কথায় কান না দিয়ে আবার হেসে বললে,—ভাই,

রাগ কর, আর যাই কর, বলতে কি, আমি তোমার অজ্ঞতা দেখে হেসেছি।

যে নিজেকে খুব বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং সকলের চেয়ে বড় ব'লে মনে করে, তাকে মূর্খ বললে, চটেই থাকে। তাই কুয়োর ব্যাঙও তেলে-বেগুনে জ্বলে

এত জল! আমি কখন এত জল দেখিনি……

উঠল। রেগে দু চোখ লাল ক'রে বললে,—খবরদার্! মুখ সামলে কথা ক! যা মুখে আসছে তাই যে বলছিস্! ঘুসিয়ে মুখ ভেঙে দোব! মেরে হাড় গুঁড়ো করব।

সহুরে ব্যাঙ একটুও রাগলে না, বরং মিষ্টি ক'রে বললে,—রাগ কর

কেন ভাই! আমি তোমার সকল দিক না ভেবে না বুঝে, তোমায় মূর্খ ব'লে ভুল করেছি। এখন বেশ বুঝেছি, তুমি অতি শৈশবে এই কুয়োয় এসে পড়েছ, এই কুয়োর মধ্যেই এত বড় হয়েছ, তাই তুমি এই কুয়োটাকেই সর্বস্ব বলে জেনেছ,—এর চাইতে বৃহৎ রাজ্য যে আছে সে জ্ঞান, তোমার আদবে নাই। তুমি কেন ভাই, ছুনিয়াটাই এই ভুলে ভরা,—কেউ কাকেও ছোট দেখে না, সকলেই কর্তা।

এই ব'লে সহুরে ব্যাঙ, কুয়োর ব্যাঙের দুই হাত ধরে ক্ষমা চাইল।

কুয়োর ব্যাঙের রাগ পড়ে গেল, মুখে হাসি দেখা দিল। হাসি মুখে বললে,—কি বলছ ভাই, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনি, যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হচ্ছে। সত্যই কি এর চাইতে বড় দেশ ও জলাশয় আছে? বল ভাই বল, এ কথা জানবার জন্যে আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।

সহুরে ব্যাঙ তখন বললে,—ব্যাকুল হবারই কথা। তোমার মনটা সরল, তাই আমার কথায় প্রত্যয় হচ্ছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা এত দেমাকি যে, তারা কারও কথা বিশ্বাস করে না, এমন কি বড় বড় পণ্ডিতের কথাও হেসে উড়িয়ে দেয়। তুমি তা নও।

কুয়োর ব্যাঙ তখনও বিশ্বাস করতে পারলে না, এ কেমন ক'রে হয়।

একদিন একটি ছোট মেয়ে, সেই কুয়ো থেকে বালতি ক'রে জল তুলতে এল। সহুরে ব্যাঙ সুযোগ বুঝে কুয়োর ব্যাঙকে সঙ্গে নিয়ে সেই বালতির জলে লুকিয়ে রইল। বালতি কুয়োর পাড়ে তুলবামাত্রই, সহুরে ব্যাঙ কুয়োর ব্যাঙকে নিয়ে লাফাতে লাফাতে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা পুকুর পাড়ে এসে পড়ল। কুয়োর ব্যাঙ পুকুর দেখে আশ্চর্য

হ'য়ে ব'লে উঠল,—এত জল! আমি জন্মে অবধি এত জল কখন দেখিনি!

সহুরে ব্যাঙ বললে,—ভাই, তুমি এই সামান্য জল দেখেই আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছ, এটা একটা ডোবা, এর চাইতে ঢের বড় বড় পুকুর আছে; তার ওপর দীঘি, দীঘির ওপর হ্রদ, তা ছাড়া নদ, নদী, সাগর, মহাসাগর কত যে আছে তার সংখ্যা নাই। এ ত গেল জলের ভাগ। আবার স্থলের ভাগে, দেশ, মহাদেশ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং কত জাতীয় জীব-জন্তু ও গাছ-পালা যে আছে তার শেষ নাই।

কুয়োর ব্যাঙ বললে,—তা হ'লে বন্ধু, এখনও জানতে অনেক বাকি?

সহুরে ব্যাঙ বললে,—সত্যি বন্ধু, অনেক বাকি।

ছোট-বড়

—আমাদের খিড়কির বাগানের পশ্চিমে যে বড় আম গাছটা আছে, যাতে ঝুড়ি ঝুড়ি আম হয়, ওটা কত দিনের বাবা ?

—ও গাছটা কি আজকের ? আমি যখন পাঁচ বছরের তখন ঐ গাছটাকে নিজের হাতে পুঁতেছি। তারপর গরু বাছুরের ভয়ে বেড়া দিয়ে রেখে কত সার, কত খোল-পচা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। তাই এখন ঝুড়ি ঝুড়ি আম দিচ্ছে।

—আম গাছকে এত যত্ন করতে হয় না কি ? আমি ত জানি বিচি পুঁতলেই গাছ হয়।

—সব জায়গায় বিচি পুঁতলেই গাছ হয় না। আর যদিও হয়, যত্ন না করলে অনেক সময় মরে যায়, আবার অনেক সময় গাছ জন্মালেও গরু বাছুরে খেয়ে যায়। লেখা-পড়ার বেলাতেও তাই।

—লেখা-পড়া আবার গরু বাছুরে খেয়ে যায় নাকি বাবা ?

—তা যায় বৈ কি। ধর, তুমি লেখা-পড়া শিখতে স্কুলে যাচ্ছ। বেশ মন দিয়ে পড়া-শুনা করছ, এমন সময় এক দুষ্ট ছেলে তোমায় ভালমানুষ পেয়ে, তোমার পড়ার ক্ষতি করতে লাগল, এর মানে গরু বাছুরে গাছ খেলে যেমন গাছটার ক্ষতি হয়, সেই রকম তোমারও পড়ার ক্ষতি করল।

—আচ্ছা বাবা, আপনি যে বললেন, গরু বাছুরের ভঁয়ে গাছকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়, তবে এ আম গাছটা ঘেরা নাই কেন?

—কেন তা পরে বলছি। আগে বল দেখি, ছোট ছেলের উপর বেশি নজর রাখতে হয়,—না, বড়র উপর বেশি রাখতে হয়?

—ছোট ছেলের ওপর যে বেশি নজর রাখতে হয়, এ ত সকলেই জানে বাবা।

—ছোট শিশুর উপর নজর বেশি রাখতে হয় কেন, বল দেখি?

—শিশুরা দুর্বল নিজেকে রক্ষা করতে পারে না ব'লে। একদিন আমি এক জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়ে একটা টাকা ঠকেছি। মা, তাই জানতে পেরে, সেই দিন থেকে আমায় আগলাবার জন্যে পাঁড়ে দরোয়ানের ওপর ভার দিয়েছেন।

—তবেই বুঝে নাও, তুমি এখন শিশু দুর্বল বলেই, ছোট আম গাছের বেড়ার মত তোমায় রক্ষা করবার জন্যে পাঁড়ের উপর ভার পড়েছে। তোমার দাদা এখন বড় হয়েছে, এখন এই বড় আম গাছের মত তাকে আর আগলাতে হয় না; সেই এখন কত লোককে গুণ্ডা জোচ্চোরের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। তুমিও যখন দাদার মত হবে, তখন তোমার কাছে কেউ ঘেঁসবে কি? তুমিই বল।

—ইস্! তখন দাদুর মত আমার গায়ে খুব জোর হবে। একটা কথা শুনবেন বাবা। সে দিন একটা কাবুলি, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে খামকা ঝগড়া

ক'রে, তাঁকে মেরে রক্তপাত ক'রে দিয়েছিল। চারদিকে বিস্তর লোক জমে গেছল, কেউ ভয়ে তার সামনে যেতে সাহস করেনি। দাদু সেই সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভদ্রলোকের দুর্দশা দেখে, সেই জোয়ান কাবুলিকে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিলেন, মাপ চাইয়ে তবে ছাড়লেন।

—এখন বুঝলে ত। গাছই হোক আর যে কোন প্রাণীই হোক, শৈশবে

আগলাবার জন্যে পাঁড়ে দরোয়ানের ওপর ভার দিয়েছেন······

রক্ষা না করলে, অনেক সময়ে অকালে নষ্ট হ'য়ে যায়। এই দেখ না কেন, এই আম গাছটাকে যদি ছোট বেলায় বেড়া দিয়ে ঘিরে না রাখতাম, আর যদি গরু বাছুরে খেয়ে মেরে ফেলত, তা'হলে কি গাছটা এত বড় হ'ত না এত ফল দিত। এখন ওর গুঁড়িতে মোষ, গরু এমন কি হাতী পর্যন্ত বাঁধা যায়।

—তা ঠিক বাবা। এতে বেশ বুঝছি বেঁচে থাকাই দরকার।" আম গাছটা অনেক কাল বেঁচে আছে বলেই আজ এত ফল পাচ্ছি, সংসারে কত উপকার হচ্ছে ; শুধু সংসারে কেন, পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতি দেশের সকলেই কিছু না কিছু উপকার পাচ্ছে।

সাহায্য করা দূরে থাকুক···

—শুধু বেঁচে থাকলে হবে না। বাঁচার মতন বাঁচতে হবে।

—বাঁচার মতন বাঁচা কি বাবা?

—কি জান, এই ফলন্ত আম গাছের মত দেশ, সমাজ ও সংসারের কল্যাণকামী হ'তে হবে। নচেৎ অফলন্ত গাছের মত দিগ্‌গজ্ লম্বা হ'য়ে, ডাল-পালায় জায়গা জুড়ে থাকলে কোন ফল নাই।

—আপনি যা বললেন তা' আমার মাথার ভেতর ঠিক ঢুকচে না। একটু পরিষ্কার করে বলুন।

—বলি কি, প্রতিদিন কত ছেলে জন্মাছে ; আর সেই সব ছেলের মধ্যে কতক পণ্ডিত কতক বা মূর্খ হচ্ছে। যে সব ছেলে লেখা পড়া ও জ্ঞান লাভ ক'রে গণ্য-মান্য হ'য়ে সংসার, সমাজ ও দেশের কল্যাণ-সাধন করছেন, তাঁরাই আমাদের এই ফলন্ত আম গাছের মত সংসার, সমাজ ও দেশবাসীকে তাঁর

সুস্বাদু ফল-স্বরূপ বিদ্যা দানে ও শীতল ছায়া-স্বরূপ জ্ঞান বিতরণে, কতই না উপকার করছেন ; কিন্তু মূর্খের দ্বারা এত উপকার পাওয়া যায় কি ? তাই বাঁচার মত বাঁচা তাকেই বলি, যে ব্যক্তি সংসার, সমাজ ও দেশের কল্যাণকামী।

—তা যদি বলেন বাবা, ওপাড়ার সিদ্ধেশ্বর বাবু ওকালতিতে কত রোজগার করেন, কিন্তু লোকটার এমন বিশ্রী স্বভাব যে, সামনে অনাহারে মরতে দেখলেও, কিছু সাহায্য করা দূরে থাকুক, মুখে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেন না। লেখা-পড়া জানা ও টাকা থাকলেই যে তাঁরা দেশ, সমাজ ও জাতির উপকার করবেন, তার কোন মানে নাই বাবা।

—তা ঠিক বলেছ, যাঁর প্রবৃত্তি সৎ তাঁরই মন পরের উপকারে ছুটে নচেৎ নয়।

—তা'হলে বাবা, বিদ্যা-বুদ্ধি, টাকা-কড়ি কিছুই কাজের নয়, সৎ-প্রবৃত্তি যার আছে, সেই মানুষ।

—ঠিকই ত। তবে মূর্খের দোষ আমি একা দিচ্ছি না। শাস্ত্রকারেরা এর দোষ এত দেখিয়েছেন যে, তা লিখে শেষ করা যায় না। এক কথায় বলতে গেলে, বিষবৃক্ষে যেমন অমৃত ফল ধরে না, সেইরূপ মূর্খের দ্বারা মন্দ ছাড়া ভাল ফল হয় না। তবে দু-একজনকে যে দেখতে পাওয়া যায়, তারা ভাল লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা ক'রে তবে ভাল হয়েছে জানবে। তুমি যদি চরিত্রবান্ হ'তে চাও, চরিত্রবান্ লোকের সঙ্গ ছাড়া গতি নাই।

—তা ঠিক বাবা। আমিও আজ থেকে আপনার উপদেশে চরিত্রবান্ লোকের সঙ্গে মিশতে বিশেষ চেষ্টা করব।
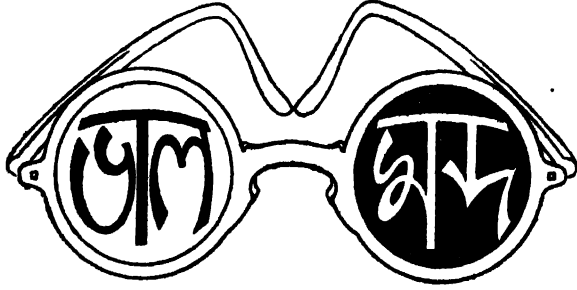
পণ্ডিত। দেখ মধু ও যদু, তোমরা ভাল ও মন্দ এই দুটো জিনিষের তফাৎ কি বলতে পার ?

যদু। ভাল কাজকে ভাল ও মন্দ কাজকে মন্দ বলে।

পণ্ডিত। ভাল কাজই বা কি, আর মন্দ কাজই বা কি ?

যদু। ভাল কাজ মানে ভাল কাজ, আর মন্দ কাজ মানে মন্দ কাজ।

পণ্ডিত। যদু তুমি থাম, মধু বল।

মধু। পড়াশুনা করা, গুরুজনকে ভক্তি করা, মানী লোকের মান রেখে চলা, দান, পরোপকার এইসব ভাল ভাল কাজ করাকে ভাল কাজ ও মন্দ কাজ যেমন খেলিয়ে বেড়ান, গুরুজনের কথা না শুনা, তাঁদের আদেশ অমান্য করা, পরের উপকার না ক'রে অপকার করা।

পণ্ডিত। পড়া-শুনা, গুরুজনে ভক্তি এ সবকে ভাল, আর এদের উল্টো কাজকে মন্দ কেন বলে বলতে পার ?

যদু। না।

পণ্ডিত। মধু কি বল?

মধু। আমি এই বুঝি, লেখা-পড়া, গুরুজনে ভক্তি, পরের উপকার, এইসব কাজে বাপ, মা আর সকলে ভালবাসেন, মনও বেশ প্রফুল্ল থাকে।

যদু। তা বুঝি! পড়তে ভয় করে না বুঝি! মার কাছে পড়া বলতে না পারলে মা মারেন, বাবা বকেন না বুঝি!

পণ্ডিত। তা'হলে দেখ, তোমাদের দু ভায়ের দু রকম মত। পড়তে তোমার ভয়, আর তাইতে তোমার দাদা মধুর ভালবাসা এই না?

উভয়ে। হাঁ পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত। বলি শোন। তোমরা দুজনে দু রকম কথা যা বললে, তোমাদের মন নিয়ে দেখলে তা'তে কা'কেও দোষ দিতে পারি না। মধু, তুমি যা বলছ তোমারও কথা ঠিক, আর যদু যা বলছে তাও ঠিক।

মধু। যদি দুইই ঠিক পণ্ডিত মশাই, তবে ভাল-মন্দ ব'লে কি কিছু নাই?

পণ্ডিত। আছে বৈ কি, না হ'লে ভাল-মন্দ ব'লে কথা উঠল কোত্থেকে। এই তোমাদের কথাতেই দেখনা, এক ভাই লেখা-পড়াকে ভাল বললে, আর এক ভাই, সেই একই লেখা-পড়াকে মন্দ বললে; এর কারণ কি জান?

মধু। তা জানি না পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত। তবে শুন। কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নেওয়া আমাদের স্বভাব। তাই যে কাজে আনন্দ পাই না, সে কাজকে মন্দ বলি। যদু পড়ার মধ্যে এখনও আনন্দ খুঁজে পায়নি, তাই তার পড়াশুনা ভাল লাগে না,—সে খেলার মধ্যে আনন্দ পায়, তাই খেলতে ভালবাসে।

যদু। হাঁ পণ্ডিত মশাই, ঠিক তাই।

পণ্ডিত। তোমরা যেমন দুজন সহোদর ভাই, ভাল ও মন্দ এরাও দুজন সহোদর ভাই, একস্থান থেকেই নির্গত হয়েছে।

মধু। কোথা থেকে নির্গত হয়েছে পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত। সে স্থান হচ্ছে মস্তিষ্ক বা মাথা।
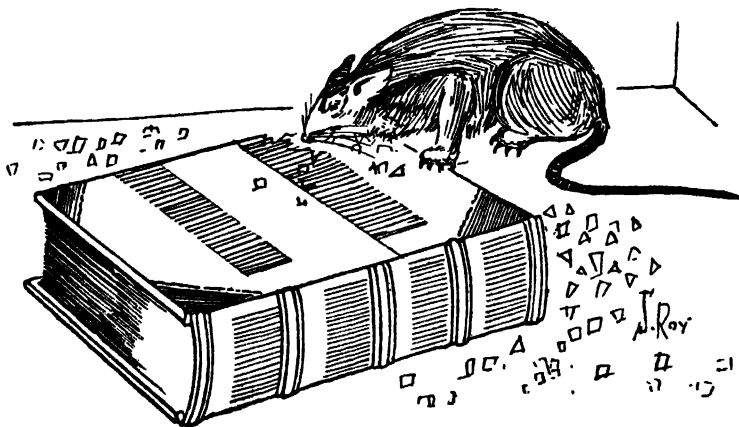
মধু। এক মাথা থেকেই যখন এ দুয়ের জন্ম, তখন একটা ভাল আর একটা মন্দ হবার কারণ কি?

পণ্ডিত। এই দেখ না কেন? তোমরা দুজনে সহোদর ভাই, অথচ পড়াশুনা সম্বন্ধে তুমি যা বললে যদু ঠিক তার উল্টো বললে।

যদু। কেন জানেন পণ্ডিত মশাই, দাদার পড়ায় যেমন আনন্দ আছে আমার তেমন নাই।

পণ্ডিত। যদু, তুমি ঠিক কথা বলেছ। আবার কখন যদি পড়া শুনায় তোমার দাদার আনন্দ না হয়, তখন তোমার মতন তারও পড়া ভাল লাগবে না। ঠিক কি না?

যদু। তা ঠিক পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত। এইজন্যে পূর্বেকার ঋষিরা বা মহাজ্ঞানীরা, ভাল কাজ ও মন্দ কাজ এ দুটি পৃথক করে দিয়েছেন। আর পৃথক করবার কারণও অনেক দেখিয়েছেন।

মধু। কারণ কি দেখিয়েছেন পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত। ঋষিরা দেখেছেন, মানুষের মন শৈশবকাল থেকেই ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে না। তাই তাঁরা নিজেদের কাজের আলোচনা ক'রে, এবং পূর্বপুরুষদের কাজের ফলাফল দেখে, কতকগুলো কাজ ভাল বলেছেন, আর কতকগুলো মন্দ বলেছেন। যে কাজের দ্বারা নিজের এবং দেশ ও সমাজের ক্ষতি হয়, সে কাজকে মন্দ বলেছেন, সে মন্দ কাজে আনন্দ হলেও মন্দ। আর ভাল কাজ করতে যদি অনেক কষ্ট পেতে হয়, এবং তার ফলে দেশ ও সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়, তা'হলে সে কাজ কষ্টজনক হ'লেও ভাল। একটা কথার কথা ধরা যাক,—লেখা-পড়া শেখা ভাল। যদি বল কেন ভাল? উত্তরে বলেছেন, লেখা-পড়া শিখলে অনেক বিষয় জানতে পারা যায়, জ্ঞান বাড়ে। এই যে পৃথিবীতে কত কি আবিষ্কার হচ্ছে, এ সবই লেখা-পড়ার গুণে, জ্ঞানের আলোকে। যে সব লোক লেখা-পড়া না শিখে মূর্খ হ'য়ে থাকে, তারা জ্ঞানের আলোক যে কি, 'তা জানতে পারে না, তাদের দ্বারা জগতের কোন কল্যাণই হয় না; অতএব লেখা-পড়া ও জ্ঞান-চর্চা যে অতি আবশ্যক তা মানতেই হবে।

যদু। লেখা-পড়ায়, জ্ঞান-চর্চায় যে উপকার আছে, তা বুঝলাম। গুরুজনে ভক্তিতে কি ফল হয় পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত। যদু, তুমি বড় ভাল প্রশ্ন করেছ। তোমরা দুজনেই এর উত্তর মন দিয়ে শোন। প্রথম কথা হচ্ছে গুরু কাকে বলে? মোটামুটি গুরু মানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যেমন তোমাদের মাতা, পিতা, কাকা, কাকী, মাস্টার, পণ্ডিত প্রভৃতি, তা তোমরা জান। মোট কথা, যাঁরা বয়সে, জ্ঞানে বড় তাঁদেরই আমরা গুরুজন বলি, নয় কি? এখন, কেন আমরা গুরুজনকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করব? তোমরা জান, আমরা ভূমিষ্ঠ হ'য়েই নিজের খাবার নিজে জোগাড় করতে পারি না, নিজের থাকবার ঘর নিজেই গড়তে পারি না, আমরা শৈশবকালে বড় অসহায়, সেই সময় মা, বাবা গুরুজনেরা আমাদের ক্ষুধার সময় আহার যুগিয়ে দেন, শোবার জন্য বিছানা ক'রে দেন, রোগে সেবা করেন, এ রকম কত কি করেন। তারপর তোমরা লেখা-পড়া শিখে যা'তে মানুষ হ'তে পার, তারজন্য তোমাদের স্কুলে পাঠান,—এমনি ক'রে তোমরা গুরুজনের কাছ থেকে কত উপকার পাচ্ছ। এত উপকার পেয়েও, তুমি যদি তার বিনিময়ে তাঁদের ভক্তি-শ্রদ্ধা না কর তা' পাপ। গুরুজনকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করলে তবে ত তাঁরা তোমার মঙ্গলের চেষ্টা করবেন, তাঁরা যে জ্ঞান আহরণ করেছেন, তা তোমায় দান করবেন। এমনিভাবে তুমিও অপরকে শিক্ষা, পরামর্শ দান করবে,—এই হ'ল মনুষ্য সমাজের মূল সূত্র। তাই মানুষের জ্ঞান কখন নষ্ট হয় না, দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায়, যুগের পর যুগ জ্ঞানের আলোকে কত নূতন নূতন জিনিস আমরা আবিষ্কার করি, তা ব'লে শেষ করা যায় না।

যদু। মা, বাবা, কাকা, কাকী, শিক্ষক, পণ্ডিত এ সব গুরুজনকে ভক্তি করলেই কি অনেক জিনিস শিখতে পারব?

পণ্ডিত। নিশ্চয়ই। তবে ভক্তি করা মানে তাঁরা যা আদেশ করবেন, যা কিছু শেখাবেন, সে গুলো প্রাণপণ ক'রে শেখা। এই ভাবে তাঁদের আদেশ মেনে চলাকেই ভক্তি করা বলে। অনেক দুষ্ট ছেলে আছে, তারা মুখে কথাবার্তায় ভক্তি দেখায়, কিন্তু কাজে একেবারে ফাঁকি। এদের উন্নতি বা ভাল কখনও হয় না।

যদু। শুধু কি আমরা গুরুজনের কাছে শিখি, আর কোথাও থেকে কিছু শিখি না?

পণ্ডিত। মানুষ ছাড়াও আমরা পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতির কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখি। এ রকম শিক্ষাগুরু ঘরে বাইরে কত যে আছে তা ব'লে শেষ করা যায় না। মধু, বল দেখি, অন্য গুরু বা শিক্ষাদাতা তোমার চোখে পড়ে কি?

মধু। পড়ে বৈ কি পণ্ডিত মশাই। মৌমাছি ও পিঁপড়ের ছোটাছুটি দেখলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়।

পণ্ডিত। ওদের থেকে কি শিক্ষা পাও বল দেখি?

যদু। ওরা ত কথা কইতে পারে না, তবে কি শিক্ষা দেবে?

মধু। যদু, তুমি পণ্ডিত মশায়ের কথার অর্থ না বুঝে, যা তা বললে চলবে কেন? মৌমাছি ও পিঁপড়েরা নাই বা কিছু বললে, ওদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখে আমাদেরও আলস্য ত্যাগ করা উচিত, এ উপদেশ কি আমাদের দিচ্ছে না?

যদু। বটে বটে,—তা খুব ভাল রকমই দিচ্ছে দাদা।

পণ্ডিত। তবেই বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখলে, দেখতে পাবে যে, গাছ-পালা, পোকা-মাকড় প্রভৃতি হ'তে লোকে নানা দিক থেকে নানা রকমে

শিক্ষা লাভ করছে। একটা গল্প বললে, আমার কথাটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাবে।

স্কট্‌লাণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস বারবার পরাজিত হ'য়ে, নিরাশ হৃদয়ে বনে চলে গেলেন। এক পাহাড়ের গুহায় একদিন তিনি বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় তিনি দেখলেন একটি মাকড়সা তার জালের একগাছি সুতো বেয়ে উপরে বাসার দিকে যাবার চেষ্টা করছে। বার বার আট বার মাকড়সাটি ওঠবার চেষ্টা করলে, কিন্তু প্রত্যেক বারই পড়ে গেল। মাকড়সাও কিছুতেই হতাশ হ'ল না, শেষে ন'বারের সময় সফল হ'ল। রাজা ভাবলেন, সামান্য মাকড়সা যদি এতবার চেষ্টা করতে পারে, তবে তিনি মানুষ হ'য়ে কেন চেষ্টা করবেন না। উৎসাহে তিনি আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং সেবারে জয়লাভ করলেন। দেখ, মাকড়সার অধ্যবসায় দেখে রাজা কতখানি উৎসাহ পেলেন, সেই উৎসাহও জয় মণ্ডিত হ'ল।

সংসারে কত সামান্য জিনিস থেকে, কত সামান্য ঘটনায় কত মহৎ শিক্ষালাভ করা যায়, তা শুনলে অবাক্ হ'তে হয়। সেকালে যখন আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষার খুবই চর্চা ছিল, তখনকার একটা ঘটনা বললে তোমরা আমার কথা বুঝতে পারবে। আজকাল যেমন তোমরা দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত স্কুলে পড়াশুনা ক'রে বাড়ি ফের, তখনকার ছেলেরা যতদিন না পাঠ শেষ ক'রে উপাধি পায়, ততদিন তারা অধ্যাপকের বাড়িতে থেকে টোলে পড়াশুনা করত।

এমনি এক টোলে বোপদেব নামে একটি ব্রাহ্মণের ছেলে পড়তে এল। ছেলেটি পড়ে বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি বড় মোটা, তাই কোন পড়া ভাল

ক'রে বুঝতে বা মনে রাখতে পারত না। ক্রমে তার সঙ্গে যারা পড়তে আরম্ভ করেছিল, তারা পাঠ শেষ ক'রে বাড়ি ফিরে গেল—কিন্তু বোপদেব যে-কে সেই রইল। অধ্যাপক রেগে বললেন, বোপদেব, তুমি বাড়ি ফিরে যাও, তোমার মাথায় কিছু ঢুকবে না।

বোপদেব মনের দুঃখে বাড়ির দিকে চলল। পথের ক্লান্তিতে এক পুকুরের সান বাঁধান সিঁড়িতে বসল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, মূর্খ হ'য়ে সে কি বংশের কুলাঙ্গার হ'য়ে থাকবে। হঠাৎ ভক্ ভক্ শব্দে সে চমকে উঠল! চেয়ে দেখে, একটি মেয়ে কলসিতে জল ভরে সিঁড়ির উপর রাখল। সে দেখল কলসিটি যেখানে রাখা হয়েছে, সেখানে একটা বেশ গভীর দাগ। বোপদেব ভাবলে কলসি রেখে রেখে পাথরের উপরে যদি দাগ পড়তে পারে, আমার মনে পড়ার দাগ পড়বে না কেন? সে তখন হৃদয়ে প্রচুর বল পেলে, ফিরে গেল অধ্যাপকের কাছে। দ্বিগুণ উৎসাহে পাঠ আরম্ভ করল, সহপাঠীদের উপেক্ষা, গঞ্জনা সব তুচ্ছ ক'রে, এক মন এক প্রাণ হ'য়ে ব্যাকরণ পাঠ সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ল। এত উৎসাহ যার, এত চেষ্টা যার, এত মনের বল যার, তার জয় নিশ্চিত। ক্রমে এই বোপদেব তখনকার কালে ব্যাকরণ শাস্ত্রে সর্বপ্রধান পণ্ডিত ব'লে গণ্য হলেন; এবং তিনি পূর্বেকার ব্যাকরণকে আরও সহজ ক'রে যে ব্যাকরণ লিখলেন, তার নাম মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পক্ষে এমন সহজ ব্যাকরণ আর নাই, তাই আজও টোলে টোলে ইহা পড়ান হয়।

যদু। পণ্ডিত মশাই, জন্তু জানোয়ার, কীট, পতঙ্গ এরা কি কেবল ভাল জিনিসই শেখায়?

পণ্ডিত। না, না। মন্দ জিনিসও শেখায়। যেমন মনে কর,

ইঁদুরের কথা। বইগুলি ইঁদুরের খাবার নয়, তবু সে আমাদের বইগুলি কেটে ছারখার করে। এই ইঁদুরের কাজ দেখে যদি বই কাটতে আরম্ভ কর, তা'হলে কেউ তোমায় ভালবাসবে না, বরং বকুনি খেতে হবে। তাই ত আগেই বলেছি, দেশ এবং সমাজের পক্ষে যেটা মঙ্গলজনক তাহাই ভাল, আর যেটা অনিষ্টজনক, তাহাই মন্দ?

—আচ্ছা দাদা, আমার ছেঁড়া ঘুড়িখানা আঠা দিয়ে জুড়বার, চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুড়ি জুড়লনা কেন?

—তা কি কখন হয়, জুড়তেই হবে।

—না দাদা, ঘুড়ি জোড়েনি, আমি ঠিক বলছি।

—তবে সে আঠা নয়, অন্য কিছু হবে।

—অন্য কিছু নয় দাদা ময়দার আঠা। তুমি যে ময়দার আঠা দিয়ে ঘুড়ি জোড় এ সেই আঠা।

—বটে, তবে জুড়লনা কেন? আমি ত এই ময়দার আঠা দিয়েই ঘুড়ি জুড়ি, বেশ জুড়ে যায় ত।

—তা ত যায়, তা আমিও দেখেছি। তবে আমার বেলায় জুড়লনা কেন, তাই ত বলচি।

—তবে আঠাটা ঠিক তৈরি হয়নি।

ঠিক হবে না কেন? তুমি যেমন ক'রে কর, আমিও ঠিক তেমনি ক'রে করেছি। তবে হয়নি কেন বলছ?

—কি ক'রে করলি বল্ দেখি?

—একটা কাঁসার বাটিতে খানিকটা ময়দা নিলাম। তাকে জল দিয়ে গুলে আগুনে চড়িয়ে দিয়ে কাঠি দিয়ে নাড়তে লাগলাম। একটু পরেই ময়দা ফুটে উঠে ডেলা পাকিয়ে জলে ঘুরতে লাগল।

—খুব গন্‌গনে আগুনে বাটি চাপিয়েছিলি ত?

—হাঁ দাদা।

—যাতে ডেলা না থাকে এমন ক'রে ময়দা জলে গুলে ছিলি ত?

—না তা গুলিনি। ময়দায় জল দিয়ে একটু নেড়েই গন্‌গনে আগুনে চাপিয়ে দিয়েছি।

—তা বুঝেছি। শুধু তা নয়, জলও বেশি দিয়েছিলি। সেই জল কমাবার জন্যে আগুনে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলি কেমন কিনা?

—হাঁ দাদা।

—আর কি হ'য়েছিল জানিস্, আঠাটা বেশি আগুনে নাড়তে নাড়তে ভট্ ক'রে শব্দ হ'য়ে একেবারে এলিয়ে পড়ল,—আঠার জোর একেবারে চলে গেল, কেমন?

—হাঁ দাদা! তুমি এ সব কেমন ক'রে জানলে ব'লে দাও না, আমার শিখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

—দেখ্, না শিখে কোন কাজ করতে গেলেই নানা দোষ এসে পড়ে। তা'তে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়।

—সে কেমন ধারা দাদা ?

—এই দেখ্‌না, সামান্য ময়দার আঠা কর্‌তে গিয়ে কত গোল হ'ল। আঠা ত তৈরি হ'লই না, বরং বেশি আগুনে ভট্‌কে গিয়ে সব নষ্ট হ'য়ে গেল।

—ভট্‌কে মানে কি দাদা ?

—ভট্‌ ক'রে শব্দ ক'রে এলিয়ে পড়া ; অর্থাৎ কোন দ্রব্যের শক্তির চাইতে খুব বেশি শক্তি দিলে, যেমন সেটা নষ্ট হ'য়ে যায়, তেমনি এই ময়দার আঠার বেলাও তাই জানবি। বলি, বেশি আগুনে আঠাটা নাড়তে লাগলি ত ?

—হাঁ দাদা।

—তা'তে হ'ল কি জানিস্‌। আগুনে ও আঠায় পরস্পর যুদ্ধ হ'তে লাগল !

—যুদ্ধ কি দাদা ?

—যুদ্ধ মানে, তুই আঠাটা শক্ত করবার জন্যে কাঠি দিয়ে নাড়তে লাগলি ; ওদিকে ময়দায় বেশি জল থাকায়, আঠাটা যথাশক্তি শক্ত হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পেরে উঠল না। এই রকমে আঠা ও আগুনে যুদ্ধ হ'তে হ'তে, আগুনের বেশি শক্তির বলে আঠা হেরে গিয়ে ভট্‌ করে চীৎকার ক'রে এলিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আঠার শক্তিও চলে গেল। না জেনে আঠা করতে গিয়ে, ফল কিছুই হ'ল না, পরিশ্রম, ময়দা, বৃথা নষ্ট হ'ল। তাই বুঝে রাখ্‌, প্রত্যেক জিনিসেই শক্তি ব'লে একটা পদার্থ আছে। সেই শক্তি যদি কোন রকমে নষ্ট হয়ে যায়, তা'হলে সেটা থাকা না থাকার সমান হয়ে দাঁড়ায়।

—ভাল বুঝলাম না দাদা ?

—তবে মন দিয়ে শোন্‌। আমার তৈরি ময়দার আঠা দেখতে তোরই সমান। দেখলে মনে হবে না যে, তোর আঠার কোন জোর বা শক্তি নাই।

—তা ঠিক দাদা। আমিও প্রথমে ধরতে পারিনি। তারপর যখন ঐতে ঘুড়ি জুড়তে গিয়ে ঘুড়ি জুড়ল না, তখন বুঝলাম ওর আঁটবার শক্তি আর নাই চলে গেছে।

ঘুড়ি জুড়তে গিয়ে জুড়ল না·········

—তা হ'লেই এখানে বুঝে নে, বাইরে বাইরে দেখলে ভেতরের শক্তি কিছুই বুঝা যায় না। বুঝা যায় তখন, যখন সেটাকে কাজে লাগান যায়, বা সেটা দিয়ে কাজ করা যায়।

—আচ্ছা দাদা, সেই শক্তির কি হ্রাস-বৃদ্ধি আছে ?

—আছে বৈ কি।

—সে কি রকম দাদা ?

—রাসায়নিক ক্রিয়া ও দ্রব্যগুণের দ্বারা প্রত্যেক জিনিসের শক্তি কমান ও বাড়ান যায়। যেমন ধর ময়দার আঠা, যদি কেউ ময়দার আঠা করবার সময় টাটকা ময়দা বেশ করে অল্প জলে গুলে, গুটি ভেঙে তাতে পরিমিত জল দিয়ে, অল্প আগুনে আঠা প্রস্তুত করে, তা'হলে গনগনে আগুনের চাইতে অল্প আগুনে খুব জোর আঠা হয়।

—তা দেখেছি দাদা। দপ্তরীদের অল্প আগুনে ময়দার আঠা আমাদের চাইতে ঢের ভাল হয়।

—এই রকমে জগতের যে কোন জিনিস, এবং গাছ-পালা জীব-জন্তু পোকা-মাকড় প্রভৃতি সকলেরই শক্তি অল্প-বিস্তর আছে জানবি।

—জল, হাওয়া, তড়িৎ আরও কত কি পদার্থ আছে, তাদের নাম ত করলে না দাদা ?

—করেছি রে করেছি।

—কোথা করলে ? কখন করলে দাদা ?

—জগতের যে কোন জিনিস বলায় ওদের সকলের নাম প'ড়ে গেছে।

—তা ভাল। তবে মানুষের নাম ত করনি দাদা ? মানুষের কি কোনই শক্তি নাই ? তুমি শক্তির কথা বলচ, অথচ জগতের মধ্যে যারা প্রধান শক্তিবান্ পুরুষ, সেই পুরুষকে বাদ দিচ্ছ।

—ভাল, ভাল, সকল জিনিসে যে শক্তি আছে, এটা বুঝে নিয়েছিস্

জেনে বড় আহ্লাদ হচ্ছে। আর জানবি, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে বড় যে-মানুষ—সেই মানুষের শক্তি, অন্য শক্তির ন্যায় হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, ইহা খুব স্পষ্ট দেখা যায়।

—কি রকমে দেখা যায় দাদা ?

—কি রকমে জানিস্? ভাল বা সৎ কাজে মানুষের শক্তির বৃদ্ধি ও মন্দ বা অসৎ কাজে শক্তির হ্রাস বা ক্ষয় হয়। অর্থাৎ যে ছেলের স্বভাব-চরিত্র ও স্বাস্থ্য ভাল, সে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানলাভ ক'রে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে এবং সুখে জীবন যাপন করে, আর যে করে না, সে দুর্বলচিত্ত ও শক্তিহীন হ'য়ে দুঃখ ভোগ করে, এই কথা।

ড্রইং মাস্টার। গোবর্ধন, এবার তুমি ড্রইংয়ে একেবারে ফেল হয়েছ! দেখ দেখি নটবর কি চমৎকার এঁকেছে, মা ও মেয়ের সজীব মূর্ত্তি যেন ফুটে উঠেছে।

ক্লাশের সকল বালক মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছবিখানি দেখতে লাগল, কিন্তু গোবর্ধনের মাথা হেঁট, বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত। নটবরের কিন্তু মুখের ভাব অন্যরূপ। আকস্মিক কোন একটা অদ্ভুত সামগ্রী দেখলে, সাধারণত লোকের মনে যেমন একটা চমকিত ভাব হয়, নটবরের সেই চমক ভাব। কিছুক্ষণ ছবির দিকে চেয়ে আপনা আপনি ব'লে উঠল,—আশ্চর্য কাণ্ড সার্! আমার ছবিতে পালিস কে মাখালে?

ড্রইং মাস্টার ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে বললেন,—পালিস কি নটবর?

নটবরও সেইরূপ বিস্মিত হ'য়ে বললেন,—সার্ এ ছবি আমি এঁকেছি সত্য,

কিন্তু পালিস মাখাই নাই। পালিস মাখাবার জন্যই ছবির ত জৌলুস বেড়ে গেছে

গোবর্ধন তেলের টিন হাতে ক'রে ছবিতে তেল ঢালছে।

ড্রইং মাস্টার অধিকতর আশ্চর্য হ'য়ে বললেন,—বল কি! তুমি এ পালিস মাখাও নাই, ঠিক বলছ না লুকোচ্চ?

নটবর। সত্য বলছি সার্, আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না।

ড্রইং মাস্টার। তবে এ কাজ কে করলে?

নটবর। জানি না সার্।

ড্রইং মাস্টার। নাঃ! এ ত ভাল নয়, এ চোর ধরতেই হবে। (ছাত্রদের প্রতি) তোমরা সকলেই একসঙ্গে এক্‌জামিন্ দিয়েছ,—তোমরা এ বিষয় কিছু জান?

ছাত্রগণ। না সার্।

ড্রইং মাস্টার। নটবর এক্‌জামিন্ দিয়ে কত আগে স্টুডিও থেকে বেরিয়েছে?

ছাত্রগণ। অনেকের আগে।

ড্রইং মাস্টার। দরোয়ান তখন কোথায় ছিল?

ছাত্রগণ। স্টুডিও ঘরের ভিতর বসে ছিল।

ড্রইং মাস্টার। নটবর যখন ছবি এঁকে স্ব স্থানে রাখতে যায়, তখন তোমরা সকলে দেখেছ?

ছাত্রগণ। হাঁ সবাই দেখেছি সার্।

ড্রইং মাস্টার। (একজন ছাত্রের প্রতি) দেখত, স্টুডিওতে কোন টিন খোলা আছে কি না?

(একজন ছাত্রের দ্রুত প্রস্থান ও খালি ছোট টিন লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ছাত্র। এই দেখুন সার্, খোলা টিন ঘরের কোণে পড়ে ছিল।

ড্রইং মাস্টার। (টিন হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া) ঠিক হ'য়েছে, এই পালিস ছবির পালিসের সঙ্গে ঠিক মিলে গেছে। তোমরা কেউ এ টিন খুলেছ?

ছাত্রগণ। না সার।

নটবর চমৎকার এঁকেছে, মা ও মেয়ের সজীব মূর্তি যেন ফুটে উঠেছে

ড্রইং মাস্টার। (একজন ছাত্রের প্রতি) দরোয়ানকে ডাক।

(ছাত্রের প্রস্থান ও দরোয়ানকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

ড্রইং মাস্টার। (দরোয়ানের প্রতি) একজামিনের দিন কে শেষে স্টুডিও থেকে বেরিয়েছিল?

দরোয়ান। গোবর্ধন বাবু।

ড্রইং মাস্টার। ওকে ঘরে কিছু করতে দেখেছ?

দরোয়ান। একটা ছোট রংয়ের টিন হাতে ক'রে ঘরের কোণে গিয়ে, কি করলেন, তারপর চলে গেলেন।

ড্রইং মাস্টার। (ছাত্রদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) গোবর্ধন এই ছিল, কোথায় গেল?

ছাত্রগণ। "আমার মাথা ঘুরছে," ব'লে সে এই মাত্র বেরিয়ে গেছে।

ড্রইং মাস্টার। তবে গোবর্ধনেরই কাজ। হতভাগা ধরা পড়বার ভয়ে পালিয়ে গেছে; নইলে সব ছেলে থাকতে সেই বা গেল কেন? বুঝেছি মাথা ঘোরা অছিলা মাত্র। এর কারণ আছে। ক্লাসের মধ্যে গোবর্ধন ও নটবরে বহু দিন থেকে রেষারিষি চলছে! নটবরের ওপর গোবর্ধনের হিংসার ভাব খুব প্রবল। সেই হিংসার বশে গোবর্ধন নটবরের ছবিতে তেল ঢেলে নষ্ট করতে গেছল। কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে সেটা তেল না হ'য়ে পালিস হওয়ায় জৌলুস বেড়ে গেছে, ছবিখানাও চমৎকার দেখিয়েছে। গোবর্ধন জানে না, হিংসায় পরের মন্দ করতে গেলে, নিজের মন্দ আগে হয়।
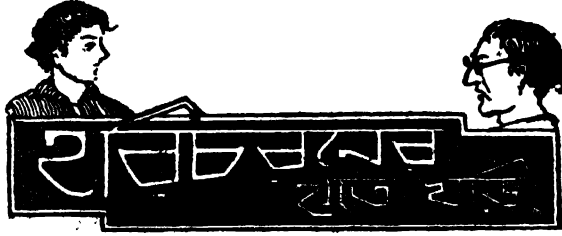
কলুটোলায় গোবিন্দ বারিক নামে এক কলু বাস করত। সংসারে তার স্ত্রী ও এক মাত্র পুত্র হরিচরণ, গোবিন্দের বুড়া বয়সের ছেলে, এ জন্য হরিচরণ বাপ মায়ের বড় আদরের। হরিচরণের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন গোবিন্দ তাহাকে পাঠশালায় দিল। পাঠশালার গুরুমশায়ের নাম বিপ্রদাস চক্রবর্তী।

পাঠশালায় যত ছেলে পড়ত, হরিচরণ তাদের সকলের অপেক্ষা বয়সে ও আকারে বড়। হরিচরণ বড় দুরন্ত বালক, সকলের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করত।—কা'কেও চিম্‌টি কেটে, কা'কেও কিল মেরে, কারও বা কান কামড়ে পাঠশালার মধ্যে মহা গণ্ডগোল বাধাত। বালকদিগের নালিশ শুনতে শুনতে বিপ্রদাস গুরুমশায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

গুরুমশায় নিজের কোষ্ঠীর লিখন মত, বালকদিগকে পানটা, তামাকটা, পয়সাটা আনতে উপদেশ দিতেন। যারা এনে দিত, গুরুমশায় তাদের বড় ভালবাসতেন। আর যারা না পারত, তাদের আর রক্ষা থাকত না; তাদের পিঠে ভাদ্র মাসের তাল পড়ত।

হরিচরণ একদিন বাড়ি হ'তে একখানা আমসত্ব এনে গুরুমশায়কে দিল, বললে,—

—ঘরে তৈরি হ'য়েছে, আমি লুকিয়ে আপনার জন্যে এনেছি।

বিপ্রদাস আমসত্ব বড় ভালবাসতেন। বিশেষ ঘরে তৈরি আমসত্ব বাজারের আমসত্ব অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট; সুতরাং গৃহে প্রস্তুত আমসত্ব পেয়ে
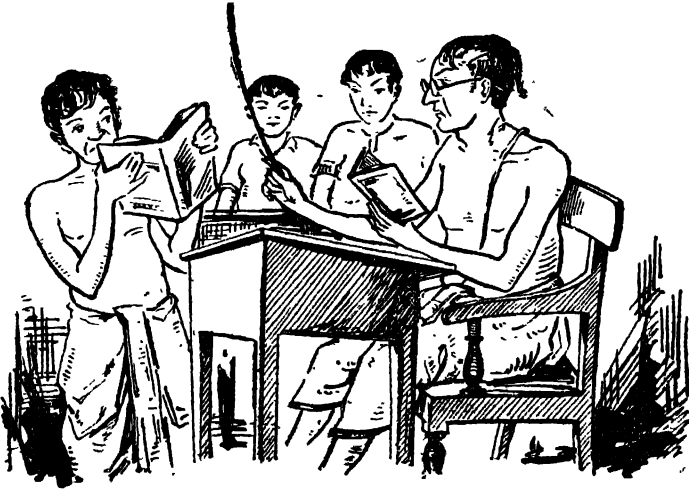
একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল।

তিনি যেন স্বর্গ হাতে পেলেন, আহ্লাদ দেখে কে? গুরুমশায় হরিচরণকে অনেক আশীর্বাদ করলেন, আরও দু চার খানা আনতে উপদেশ দিলেন। সে দিন হরিচরণের আদরের সীমা ছিল না। গুরুমশায়ের আদর দেখে হরিচরণ মনে মনে হাসতে লাগল।

পরদিন গুরুমশায়ের সে শান্ত-সৌম্য-মূর্তি আর নাই। চক্ষু দুটি জবা ফুলের মত লাল, ক্রোধে অগ্নি-শর্মা হ'য়ে তিনি পাঠশালায় প্রবেশ করলেন। তাঁর ভীষণ মূর্তি দেখে সকল বালক থর থর কাঁপতে লাগল।

গুরুমশায় পাঠশালায় প্রবেশ ক'রে সজোরে কয়েকবার ভূতলে বেত্রাঘাত করলেন; সিংহনাদ ক'রে ব'লে উঠলেন,—

—হতভাগা, পাজি, বদমায়েস একবার এলে হয়।

ক্রোধান্ধ গুরুমশায় অস্থির হয়ে বেত্রহস্তে পাঠশালার অঙ্গনে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। হরিচরণকে আসতে না দেখে গুরু-গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন,—

—কেষ্টা, পড়া দিয়ে যা।

কৃষ্ণচন্দ্র কাঁপতে কাঁপতে গুরুমশায়ের সম্মুখীন হ'ল, কম্পিত-স্বরে পড়তে লাগল,—

—একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল।

সক্রোধে বিকট চীৎকার ক'রে বেত্র নাচাতে নাচাতে গুরুমশায় বললেন,—

—পাজী, গাধা, দেখে পড়্।

গুরুমশায়ের মূর্তি দেখেই বালকের প্রাণ কেঁপে উঠল, বেত্র-দণ্ডের উপর দৃষ্টি রেখে সে আবার কেঁপে কেঁপে পড়তে লাগল,—

—একদা এক বাপের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।

গুরুমশায় একে রেগেছিলেন, তার ওপর কৃষ্ণচন্দ্রের পাঠে ভুল হওয়ায় ভাঁটার মত রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি ঘুরিয়ে বললেন,—

—বাপের গলায় কিরে, চোক নেই—"প" না "গ"? ব'লে বেত্রাঘাত করলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে,—

"প"—"প"—"প"!

এমন সময়ে হরিচরণ প্রবেশ করল। দূর হ'তে গুরুমশায়ের বিকট মূর্তি দেখে হরিচরণ হাসছিল। যখন নিকটবর্তী হ'ল, তখন অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখল। কেউ যদি সে দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, তা'হলে

আমসত্ত্বের ভেতর কুঁচ কুঁচ চামড়া...

দেখতে পেতেন, হরিচরণ পাঁচ সাতটা জামা গায়ে দিয়ে বর্মাচ্ছাদিত বীরপুরুষের মত সজ্জিত হ'য়ে এসেছে।

দর্শনমাত্র গুরুমশায় দৌড়ে গিয়ে সজোরে হরিচরণের হাত চেপে ধরলেন। যথাস্থানে টেনে বজ্রনির্ঘোষে বললেন,—

—হাঁরে হরে, আমসত্ত্ব কোথায় পেয়েছিলি ঠিক করে বল্ ?

গুরুমশায়ের সে বিকট মূর্তি দর্শন ও বজ্রনাদ শ্রবণ ক'রেও হরিচরণের মুখের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সে অম্লান বদনে বললে,—

—মা ঘরে করেছে।

—আমার কাছে মিছে কথা! তোর মা আমসত্ব করেছে! মিথ্যাবাদী—পাজি—বদ্‌মাস!

—হাঁ সত্যি বল্‌ছি, মা নিজের হাতে করেছে।

—তোর মিছে কথা। তোরই ঐ কাজ, তুই করেছিস্!

—আমি কিছুই জানি নি।

ক্রোধে বার কতক মাটিতে বেত্রদণ্ড ঠুকে বিপ্রদাস বললেন,—

—তোর মা আমসত্বে চামড়া দিতে গেছে!

চামড়ার কথা শুনে, হরিচরণ যেন আকাশ হ'তে পড়ল, বললে,—চামড়া কি গুরুমশায়, আমসত্বে চামড়া কি ?

বিপ্রদাসের রাগ আরও বেড়ে উঠল। অন্য বালক হ'লে অনেক পূর্বে তার পিঠ ফাটত; কিন্তু গুরুমশায় হরিচরণকে বিশেষ চিনেছিল, প্রহারে কোন কথা বার করতে পারবেন না বুঝে, তিনি সরোষে বললেন,—

—বদমাস্ তুই কিছু জানিস্ না! আমার কাছে ন্যাকামি! এখনও বল, তা না হ'লে এই বেত তোর পিঠে ভাঙ্গব!

এই বলে শাসিয়ে, গুরুমশায় সেই বেত গাছটি হরিচরণের পিঠের ওপর নাচাতে লাগলেন।

হরিচরণ তা'তে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বললে,—

—আমি কিছুই জানি না।

হরিচরণ লম্বা লম্বা পায়ে···

তথাপি বিপ্রদাসের সন্দেহ গেল না, তিনি বললেন,—

—তবে তোর মাকে জিজ্ঞেস্ করতে পাঠাই ?

এইবার হরিচরণের মুখ শুকাল; কিন্তু চকিতে ভয় সম্বরণ ক'রে সতেজে বললে,—

—হাঁ, স্বচ্ছন্দে পাঠান।

যে সময়ে বিপ্রদাস ও হরিচরণের এরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলছিল, সেই সময়ে একটি ভদ্রলোক এসে গুরুমশায়কে জিজ্ঞেস করলেন,—ব্যাপার কি?

গুরুমশায় বললেন,—

—ব্যাপার বড় ভয়ানক! কাল এই ছোঁড়াটা আমাকে একখানা আমসত্ব দিয়ে বলেছিল, ঘরে তৈরি আমসত্ব। আমি ঘরে গিয়ে খাবার সময় গরম দুধে সেই আমসত্বের একখণ্ড ফেলে দিলাম। মনে করলাম, আজ খাওয়াটা হবে ভাল। কিন্তু পরে দেখি, আমসত্বের ভেতর কুঁচ কুঁচ চামড়া! ভাবুন দেখি হতভাগার কি আক্কেল খানা! জিজ্ঞেস কর্‌লে বলে কি না, মা করেছে। কাজ ওরই।

ভদ্রলোকটি আর হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না, উচ্চরবে হেসে উঠলেন। গুরুমশায় খুব জব্দ হয়েছেন জেনে, সকল বালক খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। হরিচরণ সেই অবসরে একেবারে দৌড়।

গুরুমশায় বেত্রহস্তে হরিচরণের পিছু পিছু ছুট্‌লেন, ধরতে পারলেন না; হরিচরণ লম্বা লম্বা পায়ে, দুই চারি লাফে, অদৃশ্য হয়ে গেল। গুরুমশায় হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন।

*   *   *   *   *

দুষ্টামিতে হরিচরণের এই হল হাতেখড়ি। জীবনে সে আরও কত কি মন্দ কাজ করেছে, তার খবর নাইবা তোমরা জানলে। তবে এইটুকু তোমরা জেনে রাখ, তা'কে পাপের শাস্তি পেতে হয়েছিল, এবং সারা জীবনে কখন সে প্রকৃত সুখ পায়নি।

বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তখনকার কালে লোকেরা পক্ষীজাতিকে অতি পবিত্র চক্ষে দেখত। তাদের যত্নে রেখে বহু পুণ্য সঞ্চয় করত। এমন কি বাড়ির কর্তা তাঁর শোবার বা রান্নাঘরে তাদের আশ্রয় দিয়ে আপনাকে মহা পুণ্যবান্ ব'লে মনে করতেন।

সেই সময়ে বারাণসীর একজন প্রধান বণিকের পাচক খড় কুটো দিয়ে পায়রার খোপ তৈরি ক'রে তা'তে একটি পায়রাকে অতি যত্নে রেখে ছিল। পায়রাটি প্রতিদিন প্রাতে আহার অন্বেষণে বাইরে যেত। সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে এসে খোপের মধ্যে রাত কাটাত।

একদিন এক কাক রান্নাঘরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে নানারকম রান্নার গন্ধ পেলে। সেই অবধি সে সেই রান্নাঘরে ঢুকে চুরি ক'রে খাবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

এক সন্ধ্যায় দেখলে, একটা পায়রা সেই রান্না ঘরে ঢুকছে। তখন সেই ধূর্ত কাক মনে মনে একটা মতলব ঠাউরে নিলে। পরদিন সকালে পায়রা যেমন খাবার খুঁজতে বেরুল, কাকটাও অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পায়রা, কাককে তার সঙ্গে যেতে দেখে বললে,—ওহে কাক, তুমি আমার

সঙ্গে কোথা যাচ্ছ? কাক বললে,—ভাই তোমার চালচলন আমার বড় ভাল লেগেছে, তাই তোমায় ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

পায়রা বললে,—বন্ধু, আমার সঙ্গে থাকলে তোমার আহারের সুবিধা হবে না, আমার খাবার আর তোমার খাবার এক নয়।

কাক বললে,—ভাই, তা'তে তুমি কিছু ভেব না, আমার খাবার আমি নিজেই খুঁজে নোব,—তোমার কাছে থাকতে পেলেই আমি খুব খুশি হব।

পায়রা বললে,—আচ্ছা তাই হোক। কিন্তু বন্ধু. খুব সাবধান, যেন স্বভাব নষ্ট করো না।

—না বন্ধু না, তোমার কোন ভয় নেই। আমার নাম অজয়,—মানে প্রবৃত্তি আমার কাছে পরাজয় মেনেছে।

—বেশ, তবে তুমি এখানে,—থেকে যেতে পার।

এই ব'লে পায়রা রোজ যেমন মাঠে চ'রে শস্য খায়, সে দিনও চরতে গেল, আর কাকটা আস্তাকুড়ে গিয়ে পোকা মাকড় খেয়ে পেট ভরাতে লাগল।

কাকটা সেদিন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে নিজের সাধুতা জানিয়ে পায়রাকে এসে বললে,—তুমি বড় পেটুক।

পায়রার খাওয়া শেষ হ'ল, বেলাও প'ড়ে এল, পায়রা ঘরের দিকে চলল,— কাকটাও তার সঙ্গে সঙ্গে রান্না ঘরে ঢুকল।

পাচক, কাককে পায়রার বন্ধু ভেবে, কিছু না ব'লে, কাকের জন্যে অন্য একটা খোপ রান্না ঘরে ঝুলিয়ে দিল।

পায়রা ও কাক দুজনে মনের সুখে বাস করতে লাগল।

একদিন রসুইকর রান্না করবার জন্যে নানা রকম মাংস নিয়ে এল। কাকটা তাই দেখে তার নোলা সগ্‌বগ্‌ করতে লাগল। সে পেট ব্যথার ভাণ

ক'রে সমস্ত রাত চীৎকার ক'রে কাটাল। ভোরে পায়রা কাককে বললে,—চল বন্ধু চরতে যাই।

কাক বললে,—না ভাই আজ আমি যেতে পারব না, পেটটা বড্ড ব্যথা করছে

পায়রা বললে,—বন্ধু, তোমাদের পেটে ব্যথা ধরে এমন কথা ত কখন শুনিনি; আজ তোমার মুখে এই প্রথম শুনছি। আমার বেশ মনে হচ্চে, মাংস খাবার লোভে তোমার পেটে ব্যথা ধরেচে। যদি ভাল চাও ঐ লোভ ছাড়, আমার সঙ্গে মাঠে চরবে চল।

কাক, বেশি যন্ত্রণার ভাণ ক'রে বললে,—না ভাই আজ আমি কিছুতেই যেতে পারব না।

পায়রা আর কিছু না ব'লে, অন্য দিনের মত মাঠে চরতে গেল।

রসুইকর রান্না শেষ ক'রে, হাঁড়িতে ঢাকা দিয়ে, যখন বাইরে অন্য কাজে গেছে; সেই সময়ে লোভী কাক খোপ থেকে বেরুল। ঢাকা খুলে একটা মাংসের টুকরো ঠোঁটে ক'রে নিল। তারপর খোপের ভেতর ঢুকে বেশ মনের সুখে খেল। খেয়ে যেমন আর একটা টুকরা নিতে যাবে অমনি অসাবধানে হাঁড়ির ঢাকনাটা মেঝেতে প'ড়ে ঝনাৎ ক'রে উঠল। পাচক শব্দ পেয়েই ছুটে ঘরে ঢুকে দেখলে কাকটা হাঁড়ির ভেতর থেকে মাংস মুখে ক'রে পালাবার চেষ্টা করছে।

কাককে তখনি পাচক ধরে ফেললে। রেগে বললে,—তোর আস্পর্ধা ত বড় কম নয়। আমি মনিবের জন্যে খাবার তৈরি করেছি, আর তুই সব নষ্ট ক'রে দিলি।

এই বলে রাগে তার গা থেকে সব পালক ছিঁড়ে ফেললে। তারপর

মুন আর মরিচ বেটে গায়ে মাখিয়ে খোপের ভেতর রেখে দিলে। কাক যাতনায় আর্তনাদ করতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় পায়রা ঘরে ফিরে এসে কাকের দুর্দশা দেখে বললে,—যেমন আমার কথা না শুনে লোভ ক'রে খেয়েচ, তার শাস্তি হাতে হাতে পেলে। তুমি না বলেছিলে প্রবৃত্তি তোমার কাছে পরাজয় মেনেছে—কিন্তু বন্ধু, কার্যগতিকে দেখছি ঠিক তার উল্টো। তুমিই প্রবৃত্তির কাছে পরাজয় মেনেছ—তাই তোমার এ শাস্তি। তুমি স্বেচ্ছাচারী। তোমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর কথাও শুনলে না, তাই আজ তোমার এই পতন।

যন্ত্রণায় কাক মারা গেল।

সেকালের বাঙলার কবি

কৃত্তিবাস

রামায়ণ পড়বার সময় নিশ্চয়ই তোমরা কৃত্তিবাসের নাম শুনেছ। প্রায় ৫০০ বছর আগে এই মহাপুরুষ বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কৃত্তিবাসের বাড়ি ছিল ২৪ পরগণা জেলার ফুলিয়া গ্রামে। কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী, আর তাঁর মায়ের নাম মালিনী। কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষরা সকলেই বিদ্বান ছিলেন। কৃত্তিবাসও বেশ পণ্ডিত ছিলেন এবং তখনকার বাংলাদেশের রাজা গণেশ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সভাকবি পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই রাজা গণেশেরই অনুরোধে তিনি বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। সেই রামায়ণই আজ বাংলার ঘরে ঘরে সকলে পড়ছে। হয়ত তোমরাও কেউ কেউ পড়ে থাকবে।

কাশীরাম

কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন, তেমনি কাশীরাম বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন। বাংলা সাহিত্যে এই দুইখানি মহাকাব্য আজও শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার ক'রে আছে। কাশীরাম কৃত্তিবাসের অনেক পরের কবি,—প্রায় ২০০ বছর পরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত। বর্ধমানে সিঙ্গি গ্রামে তাঁদের ছিল বাস। কাশীরাম এক রাজবাড়িতে শিক্ষকতা করতেন। সেই রাজবাড়িতে এক কথক রোজ পুরাণ পাঠ করতেন এবং তাঁরই মুখে মহাভারতের কাহিনী শুনে তিনি মুগ্ধ হন। তখন তাঁর ইচ্ছা হ'ল তিনি পদ্যে বাংলা মহাভারত রচনা করবেন। তাঁর সেই ইচ্ছা জয়যুক্ত হয়েছে বলেই বাংলা ভাষায় এতবড় মহাকাব্য সৃষ্টি হয়েছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প তোমরা ভাল ক'রে পড়, এতে একদিকে যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি অনেক কিছু শিখতেও পারবে।

চণ্ডিদাস

চণ্ডিদাস বাংলার প্রথম বড় কবি। সে আজ প্রায় ৫০০ বছর আগের কথা—বীরভূমের নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম চণ্ডিদাস নয়, তাঁর নাম ছিল অনন্ত। তিনি চণ্ডীর পূজা করতেন ব'লে, লোকে তাঁকে চণ্ডিদাস নামে ডাকত। এই চণ্ডীর মন্দির আজও বর্তমান।

এই মন্দিরে রামী নামে এক ধোপার মেয়ে মন্দিরের ধোয়া মোছার কাজ করত। সে সাধক চণ্ডিদাসকে অত্যন্ত ভক্তি করত, এজন্য চণ্ডিদাসও তার ভক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন। চণ্ডিদাস একখানি বই লিখেছিলেন, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন—রাধা ও কৃষ্ণের উপাখ্যান নিয়ে লেখা। এই বইখানি যাত্রাগানের মত আসরে গাওয়ান হ'ত। চণ্ডিদাসের লেখা আরও অনেক গান আছে—সে গান খুব সুন্দর, তার ভাবও খুব উঁচুদরের। বৈষ্ণব—অবতার স্বয়ং চৈতন্যদেব পর্যন্ত তাঁর গান শুনতে বড় ভালবাসতেন। চণ্ডিদাস মানুষকে কত বড় ক'রে দেখেছেন, তা তাঁর লেখা থেকে বুঝতে পারবে। তিনি বলেছেন—

" শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই——"

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির বাড়ি ছিল মিথিলার বিস্ফি গ্রামে। মিথিলা বাংলাদেশের বাইরে হ'লেও বিদ্যাপতিকে বাংলার কবি বলে। কেননা বাঙালি তার কবিতা খুব ভালবাসে। বিদ্যাপতি কবিতা লিখেছিলেন তাঁর মাতৃভাষা মৈথিলীতে,—কিন্তু বাঙালির মুখে বিদ্যাপতির কবিতার ভাষা বদলে বাংলা ও মৈথিলীতে মিলে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়,—তার নাম ব্রজবুলী। মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভায় বিদ্যাপতি ছিলেন,—রাজকবি। রাণী লছমীদেবী তাঁর কবিতা শুনতে বড় ভালবাসতেন। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক কবি। চণ্ডিদাসের মত বিদ্যাপতিও রাধাকৃষ্ণের কাহিনী নিয়ে পদ রচনা করেন। তোমরা বড় হ'য়ে এ দুজনের পদাবলী প'ড়ো।

গ্রন্থকার প্রণীত

নবদুর্গা

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিপ্লবী ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের
এক অভিনব নবন্যাস। তিন রঙা হাফটোন ছবি,
৩য় সংস্করণ, মূল্য এক টাকা মাত্র।

রঙমহল

জীবনের ভুলের মোহে যে সব রঙ্গ প্রতিদিন সৃষ্ট হ'য়ে
চ'লেছে, তারই কতকগুলি নিখুঁত চিত্র।
রাজসংস্করণ, মূল্য এক টাকা মাত্র।

মেঘনাথ

(পঞ্চাঙ্ক নাট্যকাব্য)

"মনোমোহন" ও "বেতার নাটুকে দল" কর্তৃক অভিনীত
অতীত বাঙলার লুপ্তস্মৃতি ও প্রচ্ছন্ন গৌরবের চিত্র।
এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, মূল্য এক টাকা।

শাঁখা সিঁদুর

আঁধারের মধ্য দিয়ে হারিয়ে ফেলা আলোককে খুঁজে পাবার
মর্মন্তুদ কাহিনী। ত্রিবর্ণ হাফটোন চিত্র, উৎকৃষ্ট বাঁধাই,
মূল্য এক টাকা মাত্র।